ত্রয়োবিংশতিতম কঠিন চীবর দান স্মরণিকা '৯৬

রাজবন বিহার

রাজবন, রাঙ্গামাটি।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

আর্যমার্গ

কঠিন চীবর দান স্মরণিকা

১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, ২৫৪০ বুদ্ধাব্দ

সম্পাদক ঃ

ভূপেন্দ্র নাথ চাকমা

সহযোগিতায় ঃ

শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

সজ্জিত কুমার চাক্মা

নূতন বিহারী চাকমা

মূরতি সেন চাকমা

প্রতাপ চন্দ্র চাকমা

আর্যমার্গ

কঠিন চীবর দান স্মরণিকা '৯৬

ব্যবস্থাপনায়ঃ

প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগ

প্রকাশনায়ঃ

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাজবন, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশকালঃ

২৫শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইং

কার্তিক ১৪০৩ বাংলা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ

শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচ্ছদ অঙ্কনঃ

রতি কান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

কম্পিউটার কম্পোজঃ

বিন্যাস

৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি।

মুদ্রণঃ

নিও কনসেপ্ট লিঃ, চট্টগ্রাম।

পবিত্র সুভাষিত বাণী
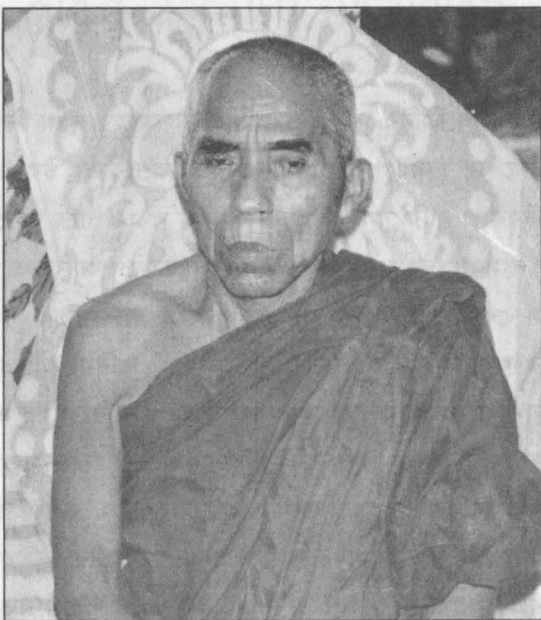
বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই পবিত্র ভূমির মূল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সঙ্গে মানবের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। যখন মানব সমাজ প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া নানা প্রকারে মিথ্যাদৃষ্টিতে জড়িত হইয়া পড়ে এবং ভোগ পরায়ণ হইয়া রাগ-দ্বেষের বীজ বপন করতঃ দুঃখিত, পীড়িত, সন্তাপিত হইয়া পড়ে তখনই সেই দুঃখ নিবারণ ও কল্যাণের নিমিত্ত পরম কারুণিক মহামানব বুদ্ধ সংসারে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরণ, স্বীয় উপদেশ, চরিত্র প্রভাবে শিখাইয়াছেন। এই কারণে প্রবাহরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। বুদ্ধ সাধারণ মানব নহেন। তিনি অনন্ত জ্ঞান, অপার করুণা এবং অগাধ বিশুদ্ধ গুণের আধার। যেমন রুগ্নের বোগ মুক্তির নিমিত্ত উত্তম ভিষকের আবশ্যকতা

থাকে, তেমন ত্রিবিধ দুঃখে তাপিত প্রাণীসমূহের দুঃখ নিবারণের জন্য নির্দোষ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ মহামানবের আবশ্যকতা চিরকাল ছিল এবং চিরকাল থাকিবে। এই জন্য অসংখ্য বৎসর পরে জগতে এক এক জন মহামানব পূর্ণ পুরুষ সম্যক সম্বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইবার মানসে বোধিসত্ত্ব কঠিন তপস্যা প্রভাবে আধ্যাত্মিক যোগ্যতা লাভের জন্য অনন্তকাল ধরিয়া পারমী পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকেন। বুদ্ধের আবির্ভাব কোন দেশ বা জাতি বিশেষের জন্য হয় না, জগতের সমস্ত জীবমন্ডলীর জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এই জন্য বুদ্ধ জগতের সমস্ত মূল্যবান রত্নাপেক্ষা মহান রত্ন। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত তাঁহার বাণী ও সংসারের সমস্ত মহার্ঘ রত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন। ধর্ম্মানুরূপ স্বীয় আদর্শ জীবন ও উপদেশ দ্বারা বুদ্ধের বাণী যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা ও জগতের সকল রত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া অভিহিত হন। যেই ভাগ্যবান ব্যক্তি এই ত্রিবিধ শরণের আশ্রয় গ্রহণ করে সে অনাবিল সুখ-শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

সাধনানন্দ মহাস্থবির -
২০-১২-৮৬

[শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)]

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের হিতোপদেশ

১

জনম হইলে তার মরণ নিশ্চিত
মিলনের সুখপাশে বিচ্ছেদ জড়িত
ভালবাসা প্রেমযত প্রীতির বন্ধন
পরিনামে দুঃখ তত বিলাপ ক্রন্দন।
ধন পরিজন কুল পূর্ণ পরিবার
কালের প্রভাবে সব হবে ছারখার।
যশঃ ধন, গর্বমান, উচ্চ পদোন্নতি
অসার অস্থায়ী সব ক্রম ক্ষম-গতি।
স্বর্ণবিনিন্দিত রূপ লাবণ্য যৌবন
ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে জরা ও মরণ।
স্মৃতির সাধনা যুক্ত কুশল চেতনা
ইহ পরলোকের তরে প্রকৃত সান্ত্বনা।

২

বিদর্শন জ্ঞান চক্ষু কর উর্ম্মিলন
রূপস্কন্ধ দেখ ঘৃণ্য অশুভ লক্ষণ।
বেদনার অনুভূতি দুঃখ হাহাকার
ক্ষনিকের ভোজবাজি অনিত্য, অসার।
সংজ্ঞা, চেতনা, স্মৃতি চিত্তের বিজ্ঞান
বিদর্শনে তৃষ্ণা দৃষ্টি হবে অন্তর্ধান।
অশুভ লক্ষণসবে দেখ বার বার
নিত্য নহে, শুধু দুঃখ সকলি অসার।
স্মৃতি জ্ঞানে চারিসত্য করহ উদ্ধার
দুঃখের স্বরূপ সত্য দেখ বারবার।
দুঃখের মূল হেতু তৃষ্ণা সমুদয়
জাতি হেতুর নিরোধে রুদ্ধ জাতি ভবোদয়।

দৃঢ় চিত্তে বিধিমত স্মৃতি বিদর্শনে
তৃষ্ণা দৃষ্টি চ্যুত হবে জ্ঞান বৃদ্ধিসনে।
ভাবনা প্রণালী ঠিক করিল বর্ণন
শান্তির সন্ধানে কর প্রজ্ঞার দর্শন।
অসতের সঙ্গমে হবে শ্রদ্ধা অবনতি
ইহ পরকালে হবে অশেষ দুর্গতি।
জ্ঞানবান সুশীলের জীবন সফল
জ্ঞান কর্মহীন তার জীবন বিফল।
জগতের অনিত্যতা করিয়া স্মরণ
পুণ্যের সঞ্চয়ে দাও দিবা নিশিমন।

৩

হবে লাভ প্রজ্ঞা জ্ঞান বিদর্শন ধ্যানে
কিছুই হবে না লাভ সাধারণ জ্ঞানে।
সুখ দুঃখ অনুভূতি জাগে অবিরাম
সুখ শুধু স্বপ্ন সম, দুঃখ পরিনাম।
বেদনায় যে কোন স্তরে– স্মৃতির সাধনা করে
দেখ ভবে সকলি অসার
নাশ মোহ অনুশয়, – ক্লেশ আদি সমুদয়
কর সদা দিবা নিশি স্মৃতিতে বিহার।

৪

ক্রোধ হিংসা তন্দ্রালস্য চিত্তানুশোচন
নাম রূপ পরার্থে সন্দেহ করণ
নিবরণ উভয়েতে স্মৃতিমান রও
উদয় বিলয় জ্ঞানে সদা জ্ঞাত হও
এইভাবে করেন তিনি স্মৃতির সাধনা
বিচ্যুত হইবে তার প্রজ্ঞাপ্তি ধারণা
পরমার্থ সত্য জ্ঞান হইলে অর্জন
সত্যাসত্য–জ্ঞান হবে যথার্থ দর্শন।

শুভেচ্ছা বাণী

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে ইহার সুখ্যাতি রহিয়াছে। এইখানে পরম সাধক আর্য্য পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) শীল, সমাধি প্রজ্ঞার বলে তাঁহার ঋদ্ধ জীবনের মহিমায় প্রতিনিয়ত বুদ্ধবাণী দেশনা করতঃ অগনিত নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

বুদ্ধের জীবিতকালে মহীয়সী নারী বিশাখার প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে এখানে প্রতিবৎসর কঠিন চীবর দানোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চলতি বৎসর ইহা উদযাপিত হইতেছে। এই উপলক্ষে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়াছেন জানিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি।

আমি এই মহান কঠিন চীবর দানোৎসব এবং প্রকাশিতব্য স্মরণিকার সাফল্য কামনা করিতেছি।

রবীন্দ্র লাল চাক্‌মা
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

শুভেচ্ছা বাণী

রাজবন বিহারে দানোত্তম কঠিন চীবর দান '৯৬ ইং উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অতিশয় আনন্দিত। পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রভাবে ধর্মীয় অনুশীলন ও অনুশাসনের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর, সুখ ও সমৃদ্ধি এবং তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলুক।

পরিশেষে অত্র প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ভবিষ্যৎ ও সাফল্য কামনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দীপংকর তালুকদার

সংসদ সদস্য

২৯৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য।

বাণী

বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসা ও মৈত্রীর ধর্ম। রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যমন্ডিত পবিত্র কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

এ উপলক্ষে 'আর্যমার্গ' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম চর্চার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। বুদ্ধের অহিংসা ও মৈত্রীর অনুসারীগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী বলে আমি মনে করি।

পবিত্র কঠিন চীবর দানোৎসব এবং এ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশনা সফল হোক এ কামনা করি।

শাহ্ আলম
জেলা প্রশাসক
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সভাপতির বক্তব্য

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বপ্নিল শহর রাঙ্গামাটি। এই রাঙ্গামাটি শহরের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত পূত পবিত্র সুরম্য রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার। প্রায় পনর একর পরিমিত ক্ষেত্রে বিহার এলাকা পরিব্যাপ্ত। ইহার সম্পূর্ণ অংশই নাতিউচ্চ বনবৃক্ষ রাজিতে পরিপূর্ণ। এখানে সারা বছর ছায়া সুশীতল এক শান্ত মনোরম পরিবেশ বিরাজ করে। বিদর্শন ভাবনা ও ধ্যান-সাধনার উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ।

এ' জগতে সবগুণে গুণান্বিত সম্যক সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, অর্হৎ, আসবহীন বুদ্ধ পুত্রগণ সর্বজনের পূজ্যাস্পদ। তাঁর সকল প্রকার তৃষ্ণা, মায়া, মোহ, শোক-সন্তাপ উত্তীর্ণ এবং সর্বভয়মুক্ত। এরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের সেবায়, পূজায়, স্মরণে, অনুসরণে যে অঢেল পূণ্যরাশি সঞ্চিত হয় তা কেউ পরিমান করতে পারে না। যেমন মহাসমুদ্রের জলরাশি পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এরূপ সর্বদোষ রহিত, পুনঃজন্ম নিরোধকারী মহাপুরুষদের চার প্রত্যয় দ্বারা পূজা করলে, সেবা করলে চতুর্প্রত্যয় দাতাগণ অপ্রমেয় ফল লাভ করেন।

পুণ্যক্ষেত্র এই রাজবন বিহার সমগ্রদেশের কোন বিহারের সাথে তুলনীয় নয়।এই বিহার একটি স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিহার। এখানে সদ্ধর্ম অনুশীলন, প্রতিপালন করার পাশাপাশি বিদর্শন ভাবনা শিক্ষা দেয়া হয়। বিদর্শনাচার্য্য আসবহীন, তৃষ্ণা বিমুক্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দুই দশক যাবৎ অত্র রাজবন বিহারে সশিষ্যে অবস্থান করছেন। বর্তমান উত্তাল অশান্তি যুগে তিনি পরম সুহৃদ, কল্যাণমিত্র, লৌকিক ও লোকোত্তর পথ প্রদর্শক। তাঁরমত মহামানবকে চতুর্প্রত্যয় দ্বারা পূজা করা, সেবা করা এবং তাঁর মুখ নিসৃত অমৃতময় সত্য ধর্ম দেশনা শ্রবণের সুযোগ পেয়েছি বিধায় আমরা ধন্য ও ভাগ্যবান। আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর সুভাষিত বাণী হল,- 'পরধর্ম বর্জন করে স্বধর্ম গ্রহণ কর। স্বধর্ম প্রতিপালনে, আচরণে বিপুল সুখ উৎপন্ন হয়।' তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে- প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে বলে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার ভিক্ষুসংঘের বসবাসের উপযোগী।

সদ্ধর্ম হিতৈষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই- সদ্ধর্মের স্থিতি, রক্ষা, উন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধি কল্পে এবং সত্য ধর্মের সুদূর প্রসার ও প্রচারের জন্য এই রাজবন বিহারের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন একান্ত অপরিহার্য্য। সর্ব প্রথমে একটি নতুন সম্মেলন কক্ষ বা দেশনালয় নির্মাণ করা অতীব প্রয়োজন। দু'দশক আগে নির্মিত দেশনালয়টি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। তাই, বিহার পরিচালনা কমিটি যুগপৎ স্থাপত্য শিল্পের আদলে এক বিশালায়তন দেশনালয় তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। আমি আশা করি সদ্ধর্ম প্রাণ দায়ক–দায়িকাদের সহৃদয়তা, আন্তরিক সহযোগিতাই হবে প্রকল্প বাস্তবায়ন পুঁজির ভিত্তি।

আজ ত্রয়োবিংশতিতম কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপিত হচ্ছে। এই মহতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'আর্যমার্গ' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশনা পরিষদ সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল এই স্মরণিকা। আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অদ্যকার এই মহতী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য পরিচালনা কমিটিকে যাঁরা সর্বাত্মক সহযোগিতা যেমন অর্থ, বস্তু সামগ্রী, সুপরামর্শ, কায়িক শ্রম দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহয়তা করেছেন কৃতজ্ঞতার সাথে আমি তাঁদের স্মরণ করছি। পরিশেষে অদ্যকার আনন্দঘন এই পুণ্যানুষ্ঠানে যাঁরা কষ্ট স্বীকার করে সশরীরে উপস্থিত হয়ে পুণ্যের অংশীদার হয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ।

সকল প্রাণী সুখী হোক।

বিনোদ বিহারী চাক্‌মা
সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি
রাঙ্গামাটি।

তারিখঃ
২৫-১০-৯৬ ইং।

সাধারণ সম্পাদকের কিছু কথা

বাংলাদেশে বিদ্যমান শত শত বৌদ্ধ বিহারের মত রাজবন বিহার একটি সাধারণ বৌদ্ধ বিহার মাত্র নহে। অপরাপর বৌদ্ধ বিহার গুলো থেকে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ঐতিহ্য মন্ডিত বৌদ্ধ সাধনা কেন্দ্র ও পুণ্যতীর্থ।

বিগত ১৯৭৪ ইংরেজী সালে সাধক প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) লংগদু তিনটিলা হতে এখানে আগমন করেন এবং চাক্‌মা রাজ পরিবারের সদস্যগণ ও রাঙ্গামাটির বিশিষ্ট দায়ক-দায়িকাগনের আন্তরিক আমন্ত্রণে এখানে অবস্থান করতে সম্মত হন।

চাক্‌মা রাজবাড়ীর অনতিদূরে তিনপার্শ্বে হ্রদবেষ্টিত আনুমানিক পনর একর পরিমান ভূখন্ডে যেখানে চাক্‌মা রাজ পরিবার বিভিন্ন ফল ও মূল্যবান বৃক্ষরাজি রোপন করে পারিবারিক প্রয়োজনে মনোরম উদ্যান সৃজন করেছিলেন এর কেন্দ্রস্থলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য একটি অস্থায়ী বিহার নির্মাণ করা হয়। ছায়া সুনিবিড় এই বনে নির্ম্মিত বলে ইহা ক্রমে রাজবন বিহার নামে পরিচিতি লাভ করে। চাক্‌মা রাজ পরিবারের সদস্যগণ তাঁদের এই বিস্তৃত ভূখন্ড সর্ব্বজন কল্যানার্থে এবং সদ্ধর্মের উন্নতি কল্পে ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং অতীব পুন্যের অধিকারী হয়েছেন।

১৯৭৪ সালে এই বনবিহার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই রাঙ্গামাটি এবং পার্শ্ববর্তী সদ্ধর্ম প্রাণ দায়ক-দায়িকাগণ এই পর্ণ কুটির সদৃশ রাজবন বিহারকে আধুনিক সুরম্য বিহারে পরিণত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পূণ্যাকাঙ্খী বৌদ্ধদের অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এই পর্ণকুঠির দু' দশকের মধ্যে বর্তমান সুরম্য মূল বিহার, দেশীয় ঐতিহ্যমন্ডিত মনোরম উপাসনা বিহার, বিবেক সুখ প্রদায়ক সাধনা কুঠি এবং চিত্ত প্রশান্তিকর চংক্রমণ ঘর সম্বলিত একটি বৃহৎ বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সুশোভিত হয়ে উঠে।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের ঋদ্ধ জীবনের প্রভাবে ১৯৭৪ ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী বিহার ক্রমে ক্রমে পরিণত হয় একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপে।

বৃহত্তর পার্বত্যবাসীর বিভিন্ন প্রকার শ্রদ্ধাদান, বাংলাদেশের সকল উদারদাতাগণের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে মূল পাকা বিহার, উপাসনা বিহার, ভিক্ষু সীমা, ভাবনা কুঠির, চংক্রমণ কুঠি, দেশনালয়, ভিক্ষু সংঘের ভোজনশালা এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনা কুঠির। এই সমস্ত বিহার ইত্যাদি নির্মাণ কাজে সদাশয় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদান সত্যিই উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়।

এতদ্ব্যতীত বর্তমানে সর্দ্ধমপ্রাণ থাইল্যান্ডের ধর্ম প্রাণ দায়ক-দায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধমূর্তিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম নিবাসী উদারদাতা বাবু ফনীন্দ্র লাল বড়ুয়া-র অর্থানুকুল্যে একতলা একটি বিহার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে যা অনুত্তর ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে পবিত্রতম এই কঠিন চীবর দানোৎসবে হচ্ছে।

বর্তমানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদে আপামর জনসাধারণের আর্থিক শ্রদ্ধাদানে মূল বিহার ভিটার চতুর্দ্দিকে সীমানা দেওয়াল ও তৎসংলগ্ন ভিক্ষু সংঘের আবাসস্থল এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতিমূর্তি স্থাপনের জন্য একটি অত্যাধুনিক শৈল্পিক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন বিহার সহ বিহারের মূল ফটক নির্মানাধীন রয়েছে। কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ্য যে নির্মানাধীন সীমানা দেওয়াল ও তৎসংলগ্ন ভিক্ষু সংঘের আবাস স্থলের উপর ২য় তলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশ সরকারের সামরিক, বেসামরিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অকৃত্রিম সহৃদয়তা,উদার সহযোগিতার ফলে রাজবন বিহারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের প্রতি সরকারের এই আন্তরিকতা এবং পৃষ্ঠ-পোষকতাই সবাইকে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সেবার কাজ ও মানব হিতৈষনায় এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে এবং উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে এ'তে কোন সন্দেহ নেই।

পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার প্রভাব এবং তাঁর আশীর্বাদ ও করুণা এবং তথাগত বুদ্ধের অমৃতময় শান্তির বাণী ও উপদেশমূলক প্রতিদিনকার দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি, স্থিতিশীলতা, সকল প্রাণীর হিতসুখ ও মঙ্গলার্থে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে উঠেছে বহু শাখা বনবিহার। ঐ সমস্ত বিহার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কল্পে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সরকারের সামরিক বেসামরিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা সমূহের আর্থিক ও

সকল প্রকার সহযোগিতা সত্যিই প্রসংশনীয়। তজ্জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

রাজবন বিহার এলাকায় মৃত ব্যক্তির সৎকার (দাহ) কল্পে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপন প্রকল্প মাননীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সদয় অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আপামর জনসাধারণ চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবে।

রাজবন বিহার সুদূর প্রসার ও এলাকা বিস্তারের জন্য গত বৎসর আপামর জন সাধারণের শ্রদ্ধাদানে ৬.৪২ একর জমি চিনি কল সংস্থা হতে ক্রয় করা হয়। উক্ত জমি আশু সংস্কার করা প্রয়োজন।

এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আরো অনেক গঠনমূলক পরিকল্পনা রয়েছে যেমন- (১) শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ইচ্ছা মোতাবেক দশ হাজার ভিক্ষু শ্রমণ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাসহ একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন প্যাগোডা নির্মাণ, (২) ধর্মীয় পাঠাগার নির্মাণ। (৩) দশ শয্যা বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সজ্জিত হাসপাতাল, (৪) অতিথি ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য অতিথিশালা এবং (৫) পুণ্যার্থীদের জন্য একটি বিশালাকার বিশ্রামাগার নির্মাণ ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রকল্প ছাড়াও অনেক ছোট ছোট প্রকল্প রয়েছে যা অতি সত্বর বাস্তবায়ন করা অতীব প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, উপরে ৪ নং আইটেম বর্ণিত কাজ/প্রকল্প ইতিমধ্যে এল. জি. ই. ডি কর্তৃপক্ষ হাতে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক হতে রাজবন বিহার সংযোগ রাস্তাটি ও পীচ ঢালা রাস্তায় রূপান্তরিত করার কাজ হাতে নেয়ার অনুমোদন রয়েছে।

উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকর করতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। এ’ মহতী ধর্মীয় ও মানব হিত সাধনামূলক কেন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষক, এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী সদ্ধর্মানুরাগী যে মহানুভব ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদের মহানুভবতায় উক্ত পরিকল্পনা প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য একান্তভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

চলতি বছর রাজবন বিহারে ত্রয়োবিংশতিতম কঠিন চীবর দানোৎসব যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মহতী পুণ্যানুষ্ঠান সফল করার জন্য বিভিন্ন এলাকা

হতে আগত পুণ্যার্থী দায়ক-দায়িকা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সকলের কায়িক, বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা দানের ফলেই এই দানোত্তম কঠিন চীবর দান সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সূতা কাটা, বেইন বুনা এবং চীবর তৈরীর ন্যায় দূরূহ কার্য্য এতদঅঞ্চলের পুণ্যার্থী মহিলা কর্মীরা একান্ত শ্রদ্ধায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেই সম্পন্ন করেছেন। সকলের প্রতি আমাদের পুণ্যময় শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ রইল।

সর্বোপরি রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সকল সদস্য/সদস্যা এই মহতী অনুষ্ঠানকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। স্থানীয় প্রশাসনের সহৃদয় সহযোগিতা দানের ফলে সহস্র জনের সম্মিলিত পুণ্যানুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হতে পেরেছে তাই আমি পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী ও দুঃখহীন হোক।

বিনীত

ইন্দ্রনাথ চাক্‌মা

সাধারণ সম্পাদক

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

রাঙ্গামাটি।

নূতন প্রসঙ্গ

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ ও ধর্মীয় সাধনাকেন্দ্র রূপে দেশে বিদেশে সুপরিচিত। এই পুণ্যতীর্থের মাধ্যমে এতদ্‌অঞ্চলের উপজাতীয় বৌদ্ধগণ আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে নিজেদের পরিদৃশ্যমান করতে পেরেছে, তেমনি নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। অথচ তিন দশক পূর্বে তা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার। এই অত্যল্প সময়ে তা কিভাবে সম্ভব হল সেই কথা নিয়েই আমার নূতন প্রসঙ্গ।

চাকমা রাজ পরিবারের পারিবারিক প্রয়োজনে সৃজিত বিভিন্ন ফল ও মূল্যবান বৃক্ষের উদ্যান সম্বলিত পনের একর পাহাড় জুড়ে এই তীর্থের ব্যাপ্তি। সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে চাকমা রাজ পরিবারের সদস্যগণ তিনদিকে হ্রদবেষ্টিত এই প্রশস্ত মনোরম ভূখন্ড মূখ্যত শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে উপলক্ষ করে ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করেছেন। ১৯৭৪ সাল থেকে দীর্ঘ দু'দশকে তিলে তিলে এই তীর্থ কিভাবে গড়ে উঠেছে, এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার কথা এবং বাংলাদেশ সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সহৃদয় আর্থিক সহায়তার বিষয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন। রাজবন বিহার হতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত স্মরণিকা বা সংকলনে সেই পুণ্য কাহিনী বার বার বর্ণিত হয়েছে। এবারে প্রকাশিত কঠিনচীবর দান স্মরণিকা "আর্যমার্গে" সাধারণ সম্পাদক মহোদয় ও তাঁর বিবৃতিতে সেই বিষয় কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেছেন।

১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের বৌদ্ধগণের প্রতি ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনটি পবিত্র বোধিবৃক্ষ চারা উপহার প্রদান করেন। বাংলাদেশে তৎকালীন নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার মহামান্য হাই কমিশনার চরিতা রানা সিংহার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা সম্ভব হয়। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বৌদ্ধগণই বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধগণের বৃহত্তর অংশ বিধায় ঐ তিনটি বোধিবৃক্ষ চারার মাত্র একটি চারা সমতলবাসী বৌদ্ধগণের (বড়ুয়া বৌদ্ধ) জন্য দেয়া হয়। অপর দু'টি চারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণের হাতে অর্পণ করা হয়। তন্মধ্যে একটি চারা বান্দরবান বোমাং রাজ বিহার প্রাঙ্গনে রোপন করা হয় এবং অপরটি রাঙ্গামাটির এই রাজবন তীর্থের

পশ্চিম প্রান্তে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী মহোদয় ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং স্বহস্তে রোপন করেন।

বিগত বৎসর থাইল্যান্ডের ধর্মপ্রাণ এক দম্পতি অভয়মুদ্রার ভঙ্গীতে দন্ডায়মান কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত একটি বুদ্ধ মূর্তি স্বদেশ থেকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে এসে এইখানে দান করে গেছেন। এই বৎসর থাইল্যান্ডের কতিপয় ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা সম্মিলিতভাবে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) এর পদ্মাসনে উপবিষ্ট একটি অষ্ট ধাতু নির্মিত মূর্তি এই তীর্থে দান করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে প্রেরণ করেছেন। এতদুভয় মূর্তি প্রতিষ্ঠাপনের জন্য বৌদ্ধ দেশে অনুসৃত শৈল্পিক সৌন্দর্য মন্ডিত দুটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, থাই দায়ক-দায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধ মুর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠাপনের জন্য নির্মিত মন্দিরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সমতলবাসী ধর্মপ্রাণ দায়ক বাবু ফনীন্দ্র লাল বড়ুয়া বহন করেছেন।

সাধক প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) এই পবিত্র তীর্থ এবং সাধনাকেন্দ্রের সর্বজনমান্য মহাপুরুষ রূপে বিদ্যমান। পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল অঞ্চলের বৌদ্ধগণ পুণ্যাকাঙ্খী হয়ে প্রতিনিয়ত এখানে এসে বিবিধ দানীয় সামগ্রী, অষ্টপরিস্কার দান করে তাঁর সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে কৃতার্থ হয়ে থাকেন তা বলা বাহুল্য মাত্র। অবৌদ্ধ উপজাতীয় সুধীবৃন্দও মাঝে মাঝে ভক্তিপুত চিত্ত নিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে এক নজর দর্শন ও ভন্তের আশীর্বাদ লাভের জন্য আগমন করে থাকেন, তা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। অন্য সম্প্রদায়েরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পুণ্য আকাঙ্খা এবং অভীষ্ট সিদ্ধির কামনায় বিবিধ উপচার নিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তেকে অর্ঘ্য নিবেদন এবং তাঁর কাছে সুভাষিত বাণী শোনার জন্য এখানে আগমন করতে ও প্রায়ই দেখা যায়।

বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশের, বিশেষতঃ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, কোরিয়ার কুটনীতিক, ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাঝে মাঝে এখানে এসে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবং ভিক্ষু সংঘকে বিভিন্ন দানীয় সামগ্রী, সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। তাঁদের অনেকেই আনন্দ বিহার ও মোনঘর শিশু সদনেও অনুরূপ সামগ্রী দান করে থাকেন। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয়ান দেশ সমুহের বহু বিশিষ্ট কুটনীতিকও অনেক সময় এই তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে এসে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর ধর্মকথা শুনে নিজেদের ধন্য মনে করে থাকেন।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও কতিপয় বছর পূর্বে মহীয়সী বৌদ্ধ নারী পুন্যবতী বিশাখা যেভাবে একদিনের মধ্যে (চব্বিশ ঘন্টা) তুলা থেকে সুতা কেটে, কাপড় বুনে, চীবর প্রস্তুত করে তথাগত বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘকে কঠিন চীবর দান করেছিলেন এই রাজবনবিহার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রত্যেক বছর সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চীবর প্রস্তুত করে ভিক্ষুসংঘকে কঠিনচীবর দান করার প্রথা চালু রয়েছে। বাংলাদেশে অন্য কোন স্থানে এই পদ্ধতিতে কঠিনচীবর দান করা হয় না। বিশ্বের অন্য কোন বৌদ্ধ দেশে ও এই পদ্ধতিতে কঠিন চীবর দান করা হয় বা হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

এই পুণ্যতীর্থ পার্বত্য অঞ্চলের বৌদ্ধগণের অর্থাৎ উপজাতীয় বৌদ্ধগণের জন্য নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। এখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের স্বচ্ছন্দ অবস্থানের কথা আর কারো অজানা নেই। আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে উপজাতীয় বৌদ্ধগণ এখন ভাস্বর।

এতদঅঞ্চলের চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো বা মুরং, খিয়াং, খুমী ও চাক এই সাতটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ। ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখোয়া, বম ও উচই এই পাঁচটি জনগোষ্ঠী খৃষ্টান ও সনাতন ধর্মের অনুসারী। তাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা বৌদ্ধদের তুলনায় এক পঞ্চমাংশেরও কম। এই বারটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী শত শত বৎসর ধরে সম্প্রীতি ও সখ্যতার মধ্যদিয়ে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে দ্বন্ধ সংঘাতের উল্লেখযোগ্য কোন নজীর নেই। সকলের জীবিকার পদ্ধতি (জুম চাষ) একইরকম বিধায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় একই রকম বলা চলে। তাই তাদের সমাজ জীবনে যেমন একই রকম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তেমনি মনন ক্ষেত্রেও একাত্মবোধ অতি সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ের গভীরে জন্মলাভ করে রক্তের সঙ্গে মিশে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই সবার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ এবং স্বাজাত্যবোধ।

রাজবনবিহারের মাধ্যমে বর্তমানে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে উপাজাতীয় বৌদ্ধ গণের যে সচ্ছন্দ অবস্থান আমরা লক্ষ্য করছি তার যাত্রার শুভলগ্ন ছিল ১৯৬৬ সালে। রাঙ্গামাটি রাজবিহারে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবিরকে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাস্থবির বরণ অনুষ্ঠানেই সেই শুভলগ্নের জন্ম। সেই অনুষ্ঠানটি ছিল আন্তর্জাতিক। সদ্ধর্মপ্রবর্ধক

চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রাঙ্গামাটির বুদ্ধিজীবি মহল ছিল সেই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা। স্বনামধন্য রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন এম. এল. এ প্রয়াত কামিনী মোহন দেওয়ান, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট প্রয়াত বলভদ্র তালুকদার, প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি কৃষ্ণ মোহন খীসা, ধর্মপ্রাণ সমাজকর্মী প্রয়াত তুষ্ঠ মনি চাক্‌মা, সমাজ কর্মী চিত্রগুপ্ত চাকমা, সমাজ কর্মী জীবনরত্ন চাকমা, ওভার সীয়ার সনৎকুমার বড়ুয়া, প্রয়াত বিরাজ মোহন দেওয়ান এবং আরো অনেক দায়ক গণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতির সদস্যবৃন্দ, বিশেষতঃ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রীস্থবির, শ্রীমৎ বিমলবংশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু, শ্রীমৎ চিত্তানন্দ স্থবির এই অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা দান করেন। বরনোৎসবের পূর্ব দিন গৌতমমুনি মন্দিরে সংঘরাজ শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বরণোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদুত কীর্তিনিধি বিস্তা যিনি পরবর্তীতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সস্ত্রীক যোগদান করেন। জাপানের তৎকালীন রাষ্ট্রদুত এবং কতিপয় পাশ্চাত্য দেশীয় কুটনীতিক যোগদান করেন।

বরণোৎসব সভায় নেপালের রাষ্ট্রদূত ভিক্ষু সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেত বৌদ্ধগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন যে, রাঙ্গামাটিতে এরূপ বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ভিক্ষু সংঘ ও বৌদ্ধ জনগণকে দেখে তিনি অতিশয় আনন্দিত হয়েছেন। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী তীর্থ নেপালে অবস্থিত। সমাগত জনগণের উদ্দেশ্যে লুম্বিনী তীর্থ ভ্রমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বলেন যে, লুম্বিনী তীর্থকে যেন নিজেদের দেশে অবস্থিত তীর্থ বলে সবাই মনে করেন।

রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের বরনোৎসবে আগত বিদেশী কুটনীতিকদের মাধ্যমে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে আত্মপ্রকাশের শুভলগ্ন বলা যায়। কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৮০ সালে আনন্দ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ প্রয়াত শ্রীমৎ উঃ জবনাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বার্মা (মিয়ানমার), জাপান, সহ পাঁচ/ছয়টি বৌদ্ধ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ এবং শ্রীলংকার মহামান্য হাই কমিশনার চরিতা রানা সিংহা সপরিবারে যোগদান করেন। শবদাহ অনুষ্ঠানের সুসমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য আয়োজন এবং এতদঅঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ সমাবেশ দেখে তিনি বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তৎকালীন সংসদ সদস্য

উপেন্দ্র লাল চাকমা ও অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের কয়েক জনের নিকট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, সানন্দে প্রকাশ করেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধ রয়েছেন বা বসবাস করেন তৎপূর্বে তিনি অবহিত ছিলেন না। তখনই তিনি জানতে পারেন বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধের ৮৫% পঁচাশি শতাংশ বৌদ্ধই উপজাতীয় বৌদ্ধ। (রাখাইন বৌদ্ধগণসহ) তারপর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৮১ সনে শ্রীলংকা সরকার ও জনগণ কর্তৃক বাংলাদেশের বৌদ্ধগণের জন্য তাঁরই উদ্যোগে তিনটি বোধিবৃক্ষ চারা উপহার প্রদান করা হয়- তন্মধ্যে দু'টি চারা উপজাতীয় বৌদ্ধদের জন্য তিনি বন্টন করেন যার একটি রাজবন তীর্থে রোপন করা হয়েছিল- তা আমার প্রবন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ ও পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশে গঠিত সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের অবস্থান সম্পর্কে বার বার অবহিত করতে থাকেন। তন্মধ্যে ব্যাঙ্ককে অবস্থিত World Fellowship of Buddihists এবং ভারতের মহাবোধি সোসাইটির নাম উল্লেখযোগ্য। থাইল্যান্ড হতে অষ্টধাতু নির্মিত বহু বুদ্ধমূর্তি ইতিমধ্যে পার্বত্য ভিক্ষুসংঘকে দান করা হয়েছে- যেগুলো এতদঅঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে মন্দির ও বিহার নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠাপিত করা হয়েছে বা হচ্ছে। তাইওয়ান থেকে ও বাংলায় পুনঃমুদ্রিত ত্রিপিটকের অনেক খন্ড সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। এসব বৌদ্ধ দেশ কর্তৃক এতদঅঞ্চলে এবম্বিধ সহায়তা দানের মূলে ঢাকার সাক্যমুনি বিহার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির, রাঙ্গাপানির মোনঘর কমপ্লেক্স এর মহা পরিচালক শ্রীমৎ শ্রদ্ধালঙ্কার মহাস্থবির এবং পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের কর্মকর্তাবৃন্দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আরো কতিপয় সংস্থা এইরূপ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা কল্পে বিদেশী ধর্মীয় ও মানবতাবাদী সংস্থার সাথে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখেছেন তন্মধ্যে- Hill Buddhists welfare Association এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। ১৯৮৩ সালে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাজপুত্র ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞানের, যিনি তিব্বত, চীন ও মংগোলিয়ায় বোধিসত্ত্বরূপে অদ্যাবধি পূজিত- তাঁর সহস্রতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটি আনন্দ বিহারে এক মনোজ্ঞ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের একুশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগদান করেন। পাকিস্তান ও ইরানসহ কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধি তন্মধ্যে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক এইসব অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রমের মাধমে উপজাতীয় বৌদ্ধগণ আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে ক্রমশঃ বিশ্ববাসীর কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে বা হচ্ছে। বান্দরবানের বোমাং রাজ পরিবারের সন্তান ভিক্ষু উঃ পঞ্ঞাজেত থের প্রাচ্যের বৌদ্ধ দেশে ভ্রমনের পর মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় মুসলিম দেশে ধর্মযাত্রা সম্পন্ন করে এসেছেন। তাঁর এই ধর্মযাত্রা এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

তিনদশক ধরে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধগণের জন্য যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে তাকে জোরদার করার জন্য বর্তমানে রাজবনবিহারই উপযুক্ত মাধ্যম বলে আমরা মনে করতে পারি। বিশ্বের অন্যান্য বৌদ্ধদেশে যে সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধনা কেন্দ্র রয়েছে সেই রকম অন্যতম কেন্দ্ররূপে রাজবনবিহার অচিরে পরিণত হতে যাচ্ছে। এখানে দশ সহস্রভিক্ষুর অবস্থানযোগ্য এক বিশাল মন্দির (প্যাগোডা) নির্মানের জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। ভিক্ষুদের জন্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র, ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষনা, অর্থ কথা প্রণয়ন, সর্বোপরি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এর মত বৃহৎ বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ কি অসম্ভব হবে?

ইহা আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের ভিক্ষু সংঘ বিনয় সম্মত জীবন আচরণে অভ্যস্ত এবং শীল সমাধি প্রজ্ঞার সাধনায় অনেকেই প্রভুত উন্নতি সাধন করেছেন। সদ্ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এমন দায়ক দায়িকার সংখ্যাও নেহায়েৎ কম নহে। রাঙ্গামাটির অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার এবং রাজবন বিহার হতে উন্নতমান সম্পন্ন স্মরণিকা বা সংকলন প্রায়ই প্রকাশিত হয়ে থাকে। ভিক্ষু এবং দায়কগণের সুচিন্তিত এবং প্রাজ্ঞ রচনায় সেই সব সংকলন সমৃদ্ধ। বর্তমান সংকলনটিও পূর্বে প্রকাশিত সংকলনগুলোর চাইতে নিম্ন মানের হয়েছে বলে আমি মনে করিনা।

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, এবং অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকগণসহ পরিচালনা কমিটির সকল সদস্য/সদস্যা এবং সর্বস্তরের দায়ক-দায়িকাগণ নিষ্ঠার সঙ্গে ভিক্ষুসংঘের সেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, অপরাপর পৃষ্টপোষক ও উপদেষ্টাদের মধ্যে স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, পৌরসভা

চেয়ারম্যান মনিস্বপন দেওয়ান এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান বাবু রবীন্দ্র লাল চাক্‌মা এবং রাঙ্গামাটির অন্যান্য বিশিষ্ট দায়কবর্গ উল্লেখযোগ্য সহায়তা দান করছেন। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান দ্বয়, এবং তিন পার্বত্য জেলায় তিন সাংসদ ও রাখাইন মহিলা সাংসদ প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির মূলে মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন।

বাংলাদেশ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের লালনভূমি বলে সুপরিচিত। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তা ও আর্থিক সহযোগিতাই প্রমান করে যে এখানে বৌদ্ধদের জীবন ও ধর্ম সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত।

এসবের প্রেক্ষিতে বর্তমানে ভিক্ষু সংঘ ও বিশিষ্ট ধর্মাভিজ্ঞ নেতৃস্থানীয় দায়কগণ এতদঅঞ্চলের বৌদ্ধ তীর্থ ও সাধন কেন্দ্র সমূহের অভিজ্ঞান নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে মৈত্রী সফরে বহির্গত হওয়ার সময় এসেছে। এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের মৈত্রীপূর্ণ শুভেচ্ছা সেই সেই বৌদ্ধ রাষ্ট্রে পৌছে যাবে। ফলশ্রুতিতে, চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত নিকটতম প্রতিবেশী বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের মৈত্রীবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে। বাংলাদেশের সুনাগরিক হিসেবে উপজাতীয় বৌদ্ধগণ ইহা তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করবেন আশাকরি। এই প্রসঙ্গে রাজবনবিহার পরিচালনা কমিটি প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নিতে পারেন এবং ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পদস্থ বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

সব্বে সত্ত্বা সুখিতা হন্তু।

বিনীত

শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

আহ্বায়ক

প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগ

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে আবর্তিত হয় কালচক্র। এ কালচক্রের আবর্তনে দিন যায় মাস আসে; মাসের পরে বছর। নতুন আশা আকাঙ্খা নিয়ে নতুন বছরকে মানুষ স্বাগত জানাতে চায়। এই বছরটিও নিয়ে এল অত্রাঞ্চলের বৌদ্ধ জনগণের আকাঙ্খিত সেই শুভ দিন - দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসবের দিন।

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসবে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধ বণিতা এই পুণ্য মেলায় ভিড় জমায়। সমতল ভূমির সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধরাও দলে দলে আগমন করেন। বলাবাহুল্য এত বড় দানযজ্ঞ সারাদেশে আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় কিনা সন্দেহ। আসলে এই পুণ্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষত্ব আছে বৈকি। দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর প্রধান আকর্ষণ বয়ন বিভাগ। সুতা কাটা, কাপড় বুনন, চীবর সেলাই, চীবরদান ও উৎসর্গ সবই চব্বিশ ঘন্টার সীমিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। তাই প্রয়োজন হয় যথেষ্ট লোকবলের। সূতা কাটা, কাপড় বুনন এতসব দায়িত্বের পুরোভাগে কাজ করেন স্থানীয় মহিলা কর্মী বাহিনী। সেই অতি প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত উপজাতিদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে বয়ন বিভাগ পরিচালিত হয়ে থাকে।

অত্র রাজবন বিহারে ত্রয়োবিংশতিতম দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসবের মূল অনুষ্ঠান দানকার্য আজ সম্পাদন করা হচ্ছে। এই মহতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে "আর্যমার্গ" নামে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ করা হল। এই স্মরণিকা, আমার মতে, দানোৎসব স্মৃতিকে ধরে রাখার নিছক প্রয়াস মাত্র নয়। পূত পবিত্র রাজবন বিহার কেন্দ্রিক ধর্মানুরাগীদের এটি একটি দর্পণ বিশেষ। এই স্মরণিকা মানসিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনের একটি সহায়ক ক্ষেত্র।

এবারের স্মরণিকা সংকলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘের অধিক সংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণ। তাঁদের সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ, গীতিময় কবিতা স্মরণিকাটিকে মনোজ্ঞ ও সমৃদ্ধ করেছে। আর এজন্য প্রকাশনা পরিষদ তথা বিহার পরিচালনা কমিটি পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের নিকট কৃতজ্ঞ এবং নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন। আমি বিশ্বাস করি শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুশ্রমণদের ভাবনালব্ধ জ্ঞান এভাবে প্রচার ও প্রসারের ফলে সদ্ধর্মের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে এবং আর্যসত্য জ্ঞান লাভে আমাদের সাহায্য করবে। তাছাড়া দায়ক বলয়ের যাঁরা মননশীল ধর্মীয় প্রবন্ধ,

কবিতা, গান ইত্যাদি দিয়ে সংকলনকে আকর্ষনীয় ও বৈচিত্র্যময় করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক অশেষ ধন্যবাদ। আশা করি আগামীতে আরো অধিকতর তত্ত্বসমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল লেখা দিয়ে বিজ্ঞ দায়কেরা প্রকাশনা পরিষদকে কৃতার্থ করবেন।

আর্থিক প্রতিকুল পরিবেশ থাকায় সংকলনের কলেবর আর বর্দ্ধিত করা সম্ভব হল না বিধায় কারো কারো পাঠানো লেখা বাদ পড়েছে, এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে তাঁদের লেখা ছাপানোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না - এই আশ্বাস দেয়া গেল।

স্মরণিকাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকা স্বাভাবিক। আপন জ্ঞান গরিমার গুণে ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে পাঠক সমাজ মহত্বের পরিচয় দিলে বাধিত হব। এই স্মরণিকাতে যেসব প্রবন্ধ, কবিতা, গান রয়েছে, সে সবের অন্তর্নিহিত ভাবরসে যদি কেউ আত্মতৃপ্ত হতে পারেন- তাহলে প্রকাশনার উদ্দেশ্য সফল হবে, পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

পরিশেষে, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ পর্ব। প্রথমেই স্মরণ করছি পরম শ্রদ্ধাভাজন বীরবাবুকে (বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা)। তার অনন্য ভূমিকা ব্যতীত সম্পাদকের মত গুরু দায়িত্ব আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব হত না। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সহসভাপতি বিনোদবাবু, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চাক্মা মহোদয়, প্রকাশনা পরিষদ সদস্যদের নিরলস শ্রম ও সক্রিয় সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে এবং তাঁরা সবাই ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদ শিল্পী রতিবাবু, আঙ্গিক বিন্যাসে সহায়তাকারী 'বিন্যাস কম্পিউটার কম্পোজ' -এর স্বত্ত্বাধিকারী অঞ্জন বাবুসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার নিজের ও প্রকাশনা পরিষদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সকল প্রাণী সুখী হোক
সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

তারিখ ঃ
রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার
২৫শে অক্টোবর ১৯৯৬ ইং।

ভুপেন্দ্র নাথ চাক্মা
সম্পাদক
আর্যমার্গ, কঠিন চীবর দানোৎসব স্মরণিকা '৯৬

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে ১৯৯৬ ইং সনে বর্ষাবাস অধিষ্ঠানকারী পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ

ক্রমিক নং	ভিক্ষুর নাম	ভিক্ষু জীবন (উপাসম্পদার পর)
১।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) প্রধান ধর্মীয় আচার্য	৩৬ বর্ষ
২।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির (মহাসচিব, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)	২৩ বর্ষ
৩।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ অতুল সেন স্থবির (বুড়াভান্তে)	১৫ বর্ষ
৪।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ স্থবির	১৫ বর্ষ
৫।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভদ্দজী স্থবির	১১ বর্ষ
৬।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সৌরজগত ভিক্ষু	৮ বর্ষ
৭।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শাসনা রক্ষিত ভিক্ষু	৮ বর্ষ
৮।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু	৬ বর্ষ
৯।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞান বর্দ্ধন ভিক্ষু	৬ বর্ষ
১০।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বোধিমিত্র ভিক্ষু	৬ বর্ষ
১১।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্ম্ম রক্ষিত ভিক্ষু	৫ বর্ষ
১২।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞান প্রিয় ভিক্ষু	৫ বর্ষ
১৩।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দেবমিত্র ভিক্ষু	৫ বর্ষ
১৪।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিসার ভিক্ষু	৫ বর্ষ
১৫।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ মধ্য কল্যান ভিক্ষু	৫ বর্ষ
১৬।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু	৫ বর্ষ
১৭।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ তেজপ্রিয় ভিক্ষু	৪ বর্ষ
১৮।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র ভিক্ষু	৩ বর্ষ
১৯।	শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু	৩ বর্ষ

২০। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ মহানন্দ ভিক্ষু ৩ বর্ষ

২১। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্মবোধি ভিক্ষু ৩ বর্ষ

২২। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জিনালংকার ভিক্ষু ২ বর্ষ

২৩। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শ্রীবদ্ধ ভিক্ষু ২ বর্ষ

২৪। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু ১ বর্ষ

২৫। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সত্যদর্শী ভিক্ষু ১ বর্ষ

২৬। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু ১ বর্ষ

স্থায়ী শ্রামণের

১। শ্রীমান জ্ঞানানন্দ শ্রামণের

২। শ্রীমান আর্য্যানন্দ শ্রামণের

৩। শ্রীমান ভল্লিয় শ্রামণের

৪। শ্রীমান আর্যবোধি শ্রামণের

৫। শ্রীমান জ্ঞানালোক শ্রামণের

৬। শ্রীমান ধর্মশ্রী শ্রামণের

৭। শ্রীমান অনুরুদ্ধ শ্রামণের

৮। শ্রীমান অজিতানন্দ শ্রামণের

সূচীপত্র

কবিতা

হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশী বৌদ্ধগণ

ভিক্ষু প্রিয় তিষ্য

বি. এ.

ভূমিকাঃ রাজপুত্র সিদ্ধার্থের আবির্ভাব বিশ্বের ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি পরমা সুন্দরী স্ত্রী যশোধরা দেবীকে (গোপা) পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পুত্র প্রাণের রাহুলকে ছেড়ে ২৯ বৎসর বয়সে সংসার ধর্ম ত্যাগ করে জগতের জীবগণের দুঃখ মুক্তির জন্য সন্যাসী হয়ে বেড়িয়ে পড়েন। বর্তমান বুদ্ধগয়ার বোধিতরু মূলে ৬ (ছয়) বছর কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভের পর জগতে তিনি তথাগত বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। অতঃপর শুরু হ'ল তাঁর নব আবিস্কৃত ধর্ম প্রচারে পড়েন সত্য ধর্মের দুন্দুভি বাজিয়ে ঘোষণা করেন "অপা রুতা তেসং অমতসস দ্বারং" অর্থাৎ অমৃতের দ্বার খোলা হয়েছে। এস দর্শন কর। সেই তথাগতের অমিয় বাণী শুনে দলে দলে লোক বুদ্ধের নব আবিস্কৃত ধর্মের দীক্ষা নিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র নিয়ে গঠিত হল ভিক্ষু সংঘ।

তাঁদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। সারিপুত্র ও মৌদগল্ল্যায়ন ছিলেন ব্রাহ্মণ, অনুরুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের রাজপুত্র। যশঃ প্রমুখেরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ বণিক এবং উপালি ছিলেন জাতিতে নাপিত। সুতরাং তাঁর (বুদ্ধের) সংঘের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ তাঁর সংঘে প্রবেশ করে। তাই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিশাল ভিক্ষু সংঘ গঠিত হয়। ইহা সত্যি যে, বিভিন্ন শ্রেণী মানুষের চিন্তাধারা কখনও এক হতে পারে না, সে কারণে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই দেখাদিয়েছিল ভিক্ষু সংঘের মধ্যে অসন্তোষের উত্তাপ। কৌশাম্বীর গ্রন্থধূর ও বিদর্শন ধূর ভিক্ষুদের মতভেদ এবং দেবদত্তের সংঘভেদ ইত্যাদি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। তথাপি বুদ্ধের জীবদ্দশাতে কোন বড় রকমের বিভেদ সৃষ্টি হতে পারেনি। তার কারণ, বুদ্ধ ছিলেন অসামন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সাম্য মৈত্রী করুণার একান্ত পূজারী। কিন্তু তাঁর মহা পরিনির্বাণের পর বুদ্ধের বাণী ও বিনয় নীতি ব্যাখ্যা নিয়ে তার শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রথম সংগীতির অধিবেশনে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ নিয়ে যখন ভিক্ষুদের আলোচনা চলছিল তখনই তাদের মধ্যে ঘোর মতভেদ সৃষ্টি হয়। পরন্তু মহাকশ্যপ স্থবিরের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের প্রভাবে তখনকার মতবিরোধ চাপা রয়ে যায়। কিন্তু মাত্র শত বৎসরের মধ্যে তা আবার পুনঃঘাতা দিয়ে ওঠে এবং বৈশালীর দ্বিতীয় সংগীতির অধিবেশনে দশবথুর বিচারে ভিক্ষু সংঘ দ্বিধা

বিভক্ত হয়ে কৌশাম্বী মন্ডলে গিয়ে এক মহাসভায় মিলিত হন। সে সভায় অন্তত দশ সহস্রাধিক ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাই সে সভাকে মহাসংঘ বা মহাসংগীতি অভিধায় অভিহিত করা হয়েছিল। সেই গৃহীত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তে যাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা মহাসাংঘিক নামে পরিচিতি লাভ করেন। এভাবে বুদ্ধের পরিনির্বাণের শতবৎসর পর বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ স্থবীরবাদ বা হীনযান ও মহাসাংঘিকবাদ বা মহাযান এই দু' প্রধান নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

হীনযান বা স্থবিরবাদ কি?

হীনযান অর্থ বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের মত অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীগণের মতবাদ। বুদ্ধের প্রথম শিষ্যগণের জন্য স্থবির শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। বুদ্ধোপদিষ্ট মন্তব্য সমূহের তাদের মতই সর্বাধিক প্রামাণিক যা মহাকাশ্যপাদি স্থবির পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসতেছে। সুতরাং স্থবিরবাদের অর্থ প্রামাণিক ও প্রাচীন মতবাদ।

স্থবিরবাদ বা হীনযান পরম্পরানুযায়ী বুদ্ধের শিক্ষাছিল ব্যবহারিক, তিনি ছিলেন ভবরোগের প্রধান ভিষক। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন ভবদুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। লোক শাশ্বত-অশাশ্বত অন্তধান কি অনন্তধান জীব আর শরীর এক কিংবা ভিন্ন, তথাগতগণ মরণের পর হন কিংবা এইসব অবান্তর ঝামেলাতে তিনি কোনদিন যাননি। কারণ তিনি মনে করতেন এইসব নিরর্থক বিরাগ-নিরোধ উপশম সংবেদ এবং নির্বাণ সংবর্তনীয় নয় অধিকন্তু দৃষ্টিকান্তার গ্রহণ, বন্ধন এবং দুঃখ পরিদাহের হেতু। তথাগত এইসব দৃষ্টি জালের অতীত ছিলেন। তাই তিনি এইসব দৃষ্টি জালের গ্রন্থি ছাড়াতে যাননি। কারণ তা ছিল সাধারণ শাস্ত্রের বিষয়। বিষয়ের সম্বন্ধ কোথায়? তবু পরবর্তীকালে তার শিষ্যরা এইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু তারা বুদ্ধের শিক্ষা ভুলে গিয়েছিলেন যে, এইসব দৃষ্টিজাল অর্থ সহিত নহে।

"সমস্ত পাপ কর্ম হতে দূরে থাকা, পুণ্য কর্মের উপচয় করা এবং মনচিত্তকে সর্বদা পবিত্র রাখা" বৌদ্ধ দর্শনে একে বলা হয়েছে অধিশীল, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা বা শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা। একে বলা হয়েছে বিশুদ্ধিমার্গ। কারণ প্রাণী মাত্রই তৃষ্ণারূপী, সেই তৃষ্ণাক্ষয় ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভব নয়। তৃষ্ণাক্ষয়কারী ব্যক্তিগণ নির্বাণ লাভে সমর্থ হন।

এই তৃষ্ণা বিনাশের উপায় বলা হয়েছে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি এবং প্রজ্ঞার ভাবনা, বীর্যবান ভিক্ষুরা এই তৃষ্ণারূপী জটা থেকে বিজটিত হতে সমর্থ হন। সুতরাং শীল মানবীয় জীবন ধারার প্রগতিতে মূলধারা। প্রাণী হত্যা; চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দ, কঠোর শব্দ প্রয়োগ, অহংকার, লোভ মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি হতে

বিরতিই হলো শীল বা নীতি। সমাধি মননশীলতা বা কুশলচিত্তের একাগ্রতা যার জন্য চল্লিশ প্রকার কর্মসংস্থানের বিধান আছে। মননশীলতার অর্থ হলো মন বা চিত্তকে পুন্যতয়া সন্তোলিষ রাখা! প্রজ্ঞা দ্বারা চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ জ্ঞাত হওয়া এবং সমস্ত ধর্ম অনাত্ম বা নিঃসার তখনি দুঃখ নিরোধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্কন্ড, পূর্বোক্ত রুপ, বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান এই প্রজ্ঞা স্কন্ড। আয়তন, চক্ষু, গন্ধ, রস স্পর্শ ও ধর্ম এ বিষয় মোট দ্বাদশ আয়তন। ধাতু পূর্বোক্ত ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগে উৎপন্ন হয় বিজ্ঞান এই অষ্টাদশ ধাতু। এই সমস্ত অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন।

এইভাবে যখন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অবগত হন তখন তিনি সাংসারিক জীবন ত্যাগের চেষ্টা করেন। কারণ ঈদৃশ জীবনের কোন তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে না। তখন তিনি শাশ্বত দৃষ্টি উচ্ছেদ দৃষ্টি এই উভয় পরিহার করেন। এক অন্তভোগ লিপ্সা, অন্য অন্ত আত্মপীড়ন এই উভয় অন্তত্যাগ করে মধ্যম মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন যাকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনে স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করে। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলেই সাধক নির্বাণের স্থিতিতে পৌছেন অর্থাৎ অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। অতএব, হীনযানবাদীদের আদর্শ, লক্ষ্য হলো সমস্ত দুঃখ রাশির অন্তকরতঃ অরহত্ব ফল লাভ করে অজর অমর চিরশান্তি নির্বাণ দর্শন করা।

এ হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে ভারত, নেপাল, শ্যাম, সিংহল, কম্বোডিয়া, লাওস, বার্মা এবং বাংলাদেশের বৌদ্ধরা স্মরণাতীত কাল হতে অনুসরণ করে আসছে।

পরবর্তীতে স্থবীরবাদ বা হীনযানীরা ও ১১ (এগার)টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নে এ হীনযানীদের ১১টি দলের ছক দেয়া হল–

[সূত্র– কতাকথু অটঠকথা]

উৎপত্তিকাল আনুমানিক ২৬৯ খৃঃ পূর্ব।

মহাযানের উদ্ভব ও আদর্শ :

মহাসাংঘিক নিকায় হতেই মহাযানের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি বুদ্ধ পরিনির্বাণের ১০০ (একশত) বৎসর পরে রাজাকালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত হয়। যশঃ স্থবির এই সঙ্গায়নের প্রধান পৌরহিত ছিলেন। যেখানে ৭০০ (সাতশত) অর্হৎ ভিক্ষু এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সংগীতি চলাকালে বজ্জী পুত্রিয় কতিপয় ভিক্ষু বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছিল। শুধু তা নয়, অপরাপর বিনয়ধারী ভিক্ষুদেরও ঐ ব্যাপারে তাদের সমর্থন জানাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। স্থবীর যশঃ কাকন্দকপুত্র বজ্জী ভিক্ষুদের এইরূপ আচরণের প্রতিবাদ করলেন এবং তাদেরকে এরূপ অবিনয়সম্মত গর্হিত কাজ হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে ধার্মিক লোকদেরকে আহবান করলেন। বজ্জী ভিক্ষুরা ইহা জানতে পেরে যশঃ স্থবীরকে তাদের বিরুদ্ধে এরূপ অপবাদ করতে বারণ করলেন এবং বললেন যে, তিনি যেন তাঁর বিনয় বহির্ভূত আচরণের জন্য উপাসক-উপাসিকাদের নিকট দোষ স্বীকার করেন। বজ্জী ভিক্ষুগণ যশঃ স্থবীরকে "পটিসারনীয কম্ম" নামক দন্ড প্রদান করে সে সংগীতি স্থান ত্যাগ করে কৌশাম্বী মন্ডলে এক মহাসভায় মিলিত হন এবং সে সভায় প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তে যাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন তারাই মহাসাংঘিক বা মহাযানী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের বহু কল্প পূর্বে সুমেধ তাপসরূপে দীপংকর সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা করে অধিষ্ঠান করেছিলেন, "আমার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে একাকী মুক্ত হওয়ার কিইবা সার্থকতা আছে। আমি দীপংকর দশ বলের ন্যায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে অসংখ্যপ্রাণীকে মুক্তির অবিনশ্বর আনন্দ লাভ করাব।" তিনি এও অধিষ্ঠান করলেন যে, বুদ্ধত্ব লাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে ও কোন দিন কুন্ঠিত হবেন না। তাঁর এই প্রণিধানের পর হতেই তিনি বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাংকুর নামে অভিহিত হন। তারপর থেকেই তিনি দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য আদি পারমিতা সমূহের পূর্ণতা অর্জন করতে থাকেন, যার অনুশীলন পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ ও করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে নানা যোনীতে জন্ম পরিগ্রহ করে চার অসংখ্য কল্প দানাদি পারমী সমূহে পূর্ণতালাভ করে অবশেষে সম্যক সম্বোধি লাভ করতে হয়। উক্ত দশ পারমিতা ক্রমোন্নতির নিয়মে তিন অংশে বিভক্ত হয়ে ত্রিংশ পারমিতা হয়েছে। স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন ও রাজ্যদানকে দানপারমী বলে। সুতরাং তাপস সুমেধ একজন্মের প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করেননি। অনেক জন্মের সৎকর্মের ফলেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এই আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী মহাযানী ভিক্ষুরা

বোধিসত্ত্ব চর্যা গ্রহণ করলেন। কারণ তারা বোধিসত্ত্বের কাছে অর্হত্বের আদর্শ যে স্বমোক্ষ নির্বাণ তাকে অতি তুচ্ছ মনে করলেন এবং বোধিসত্ত্বের আদর্শ যে, বিশ্বপ্রাণীর মুক্তির সহায়ক, সেই আদর্শই গ্রহণ করলেন। তাঁদের অদম্য উৎসাহ তথা জীবের অর্যচর্যার প্রতি অত্যধিক অভিলাষই পরবর্তীকালে বোধিসত্ত্বমানের বিকাশ হয়েছিল। তাঁদের আদর্শ অরহত্বরূপ ব্যক্তিগত নিঃশ্রেয়স লাভ করা নয়, প্রত্যুত অসংখ্য প্রাণীদিগকে ভবার্ণব হতে উদ্ধার করা। এ আদর্শই পরবর্তীকালে সিদ্ধান্তের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। মহাযানীদের মতে বোধি সত্ত্বগণ বিশ্বপ্রাণীর মুক্তির অপেক্ষায় নির্বাণে প্রবেশকেও স্থগিত রাখেন।

মহাযানী ভিক্ষুগন সংসারের প্রাণী সমূহের দুঃখ দূর করতঃ তাদেরকে নির্বাণে পৌছিয়ে দেয়াই স্বীয় জীবনে প্রধান করণীয় মনে করতেন। তাঁদের মতে সংসারে একটি মাত্র প্রাণী ও যতদিন অমুক্ত থাকবে ততদিন স্বয়ং নির্বাণরূপ অবিনশ্বর আনন্দেও প্রবেশ করবেনা। তাঁদের জীবনে প্রধান উদ্দেশ্য হল নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করে যাওয়া। অবশেষে সমস্ত প্রাণীদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিজেও দুঃখরাশি মূলোচ্ছেদ করে পরমশান্তি নির্বাণ দর্শন করা।

এ মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তীকালে চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ভিয়েতনাম, তিব্বত সিকিম ও ভূটান প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করেছে যা বর্তমানেও সেসব দেশীয় বৌদ্ধরা মহাযান নীতিতে অটল বিশ্বাসী। কালক্রমে এ মহাসাংঘিক বাদ বা মহাযানবাদীরা ৫ (পাঁচ) টি নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নীচে মহাযান বিশ্বাসী ৫টি নিকায়ের তালিকা দেয়া হল ঃ

মহাযানবাদঃ

(১) প্রজ্ঞাপ্তবাদী, (২) চৈত্যবাদী, (৩) লোকোত্তরবাদী, (৪) এক ব্যবহারিক ও (৫) গোকুলিক।

আলোচ্য প্রবন্ধে- হীনযান হতে উদ্ভূত ১১ (এগার)টি নিকায়ের মূল লক্ষ্য বা মতবাদ কি (?) এবং মহাযানীদের ৫টি নিকায়ের মতবাদ কি পৃথক পৃথকভাবে বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধুমাত্র মহাযানবাদের দ্বিতীয় দল চৈত্যবাদী যানের নীচে সামান্য উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে প্রবন্ধের উপসংহার টানলাম।

চৈত্যবাদী যান কি?

চৈত্যবাদীযান নিকায় ভূক্ত বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধের চারিধাতু চৈত্য নির্মাণ, অলংকরণ, পূজা এবং প্রদক্ষিণ দ্বারা বিশেষ পুণ্যার্জন করা। তাঁদের বিশ্বাস ফুল,

প্রদীপ, মালা, নানা সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করলে বিপুল সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

তাদের মতে বুদ্ধ রাগ, দ্বেষ, মোহমুক্ত এবং অন্যান্য অর্হৎগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি দশবল সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরাও দ্বেষ মুক্ত নন এবং হত্যাজনিত পাপ হতে মুক্ত নন। তাঁদের মতে নির্বাণ এক "অমত ধাতু" বিশেষ।

এভাবে কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জন্ম-জন্মান্তরে দশপারমী পূরণ করে প্রজ্ঞা উৎপন্ন করে চির দুঃখ মুক্তি লাভ করা চৈত্যবাদীযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কোনযানের অনুসারী?

আমি প্রবন্ধের মধ্যভাবে হীনযান ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করার সময় বলেছি বাংলাদেশে বৌদ্ধভিক্ষুগণ হীনযান ধর্মের বিশ্বাসী। আর একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যদিও বাংলাদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং উপাসক উপাসিকাগণ হীনযান ধর্মের বিশ্বাসী বলে মরিয়া হয়ে দাবী করেন তবু অনেকে মহাযান ধর্মের হুবহু আচার আচরণ করে থাকেন।

"ভবতু সব্ব মংগলঙ"

সহযোগী বই ঃ

১। আদি বুদ্ধ - ডঃ কানাইলাল হাজরা, ১৯৯৩ কলিকাতা।

২। History of theravada Buddhism in South-East Asia- Dr. Kanailal Hajara.

৩। বৌদ্ধ ভারত - শরৎ কুমার রায়, বিদ্যারত্ন কলিকাতা।

৪। বোধিচর্যাবতার - আচার্য্য শান্তিদেব।

৫। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মদর্শন - অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী।

৬। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন - ডঃ নীরুকুমার চাক্‌মা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষত্ব

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শন 'কর্মান্তর বাদ'। যে রকম শস্য বপন করবে তদ্রুপ শষ্যই কর্তন করবে। অর্থাৎ যে রকম কাজ করবে সে রকম ফল ভোগ করবে। বর্তমান জীবনের কর্মের প্রতিফলনই হবে পরকালের অবস্থান। অন্যকথায়, মানুষের অন্তরেই একমাত্র মানুষের সব সুখ-দুঃখের বীজ নিহিত -এ'মহাসত্যের আবিস্কারক তথাগত বুদ্ধ। তাই 'বৌদ্ধধর্ম' হল কর্মবাদী ধর্ম বা কর্মফলের বিশ্বাসী ধর্ম। এখানে উক্ত হয়- অতীত কর্ম বর্তমানে ফল প্রসব করে আর বর্তমান মুহূর্তের কর্ম পরবর্তী মূহূর্তে ফল প্রসব করে। ভালো বীজ উপ্ত হলে যেমন ভালো ফলনের আশা করা যায় তেমনি সৎকর্মের ফল নিঃসন্দেহে সুখ, বিপরীতে সীমাহীন দুঃখের কারণ বিষফল সদৃশ কুকর্ম। একটু মনোযোগের সাথে নিরীক্ষণ করলে অথবা মনোযোগী হলে দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটি ঘটনায় এ'কথার সত্যটা উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, সাধারণত আমরা সবাই নিজের ইচ্ছা বা চেতনা অনুযায়ীই কথা বলি, কাজ করিও চিন্তা করে থাকি। আমাদের মনে যে ইচ্ছা বা চেতনা উদ্ভব হয় তাই আমাদেরকে পরিচালিত করে। এককথায়, আমরা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করি তা আমাদেরই এক একজনের পার্সোন্যাল চিন্তার ফল। অর্থাৎ নিজেই নিজের পরিচালক। বুদ্ধের ভাষায়- "কম্মস্সকোমিহ, কম্মদায়াদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্ম পটিসরনো- যং কম্মং করিস্‌সামি কল্যানং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্‌সামী'তি"। -'কর্ম আমার স্বীয় সম্পত্তি স্বরূপ, কর্ম আমার দায়াদ বা অধিকার, কর্ম আমার গতি, কর্ম আমার বন্ধু, কর্মই আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। কল্যাণকর বা অকল্যানকর (পাপ) যেরূপ কর্ম করব তারই উত্তরাধিকারী হব'। কর্ম ও ফল পরস্পর নির্ভরশীল বা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কর্মকে বাদ দিলে যেমন ফলের আশা করা যায় না, তদ্রুপ ফলকে বাদ দিলে কর্মের মূল্যায়ন হয়না। বীজকে ছাড়া যেমন গাছের উৎপত্তি অসম্ভব তেমনি গাছের অস্তিত্ব না থাকলে বীজ লাভের আশা ও ভ্রমাত্মক। এভাবে কর্ম ও ফলের দ্বারা সত্ত্বগণ জন্ম-মৃত্যুর চক্রাকারে ঘূর্ণায়ন করতেছে।

লক্ষনীয় বিষয় হল- বৌদ্ধ ধর্মে পুনঃজন্ম (Rebirth process) স্বীকার করা হলেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। যেমন- অবিনাশ মৃত্যুহীন আত্মার জন্ম-জন্মান্তরে দেহ থেকে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করা। অর্থাৎ এক দেহ থেকে অন্য দেহে, এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে হুবহু বা অবিকৃত অবস্থায় সংধাবিত ও সংসরিত হওয়া -এই যুক্তি বৌদ্ধ ধর্মে স্থান পায়নি। বৌদ্ধধর্ম মতে পুনর্জন্ম হচ্ছে, নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি প্রবাহধারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করা বা পুনরুৎপন্ন হওয়া। তাই যতত পরিবর্তনশীল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চউপাদান স্কন্ধ ব্যতীত মানুষের বা সত্ত্বগণের ভিতরে অথবা বাইরে অন্য কোন নিত্য বস্তু নেই যাকে আত্মারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বস্তুত আত্মাকে আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, উহা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্ঠিমাত্র। অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের পুঞ্জীভূত অবয়ব মাত্র। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের সমবায়ে গঠিত মানুষের ভিতরে ও বাইরে অথবা উভয়ের অন্তবর্তী স্থানে কোথায়ও আত্মা নামে কোন অজর, অমর, শাশ্বত, অক্ষয়, নিত্য, ধ্রুব, অপরিনাম ধর্মী কোন বস্তু নাই। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়- যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রনে পানি নামক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পৃথক করে নেওয়া হয়, তখন পানি নামের কোন অস্তিত্বই থাকেনা। পুনশ্চ, -গাছ, বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি উপাদানে নির্মিত আকাশ পরিবৃত আকার বিশেষকে গৃহ নামে অভিহিত করা হয়। অথচ পরামর্থতঃ এক একটি উপাদান বা উপকরণ নিরীক্ষন করলে গৃহ বলে কিছুই নাই এবং তাতে গৃহের অস্তিত্বের সন্ধান মিলে না। ঠিক তদ্রুপ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে আমাদের দেহ ও জীবন প্রবাহ গঠিত এবং প্রত্যেকটিই ক্ষয়স্থায়ী, দুঃখদায়ক ও পরিবর্তনশীল। সুতরাং ইহাদের কোনটাকে আত্মা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

বৌদ্ধধর্মের অন্যতম একটা দিক হল- নৈতিকতা (Morality)। বৌদ্ধ দর্শনে মানুষের নৈতিক জীবনের এ'দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত এবং বৌদ্ধ জীবনাচারের সাথে সেভাবে সংযুক্ত। এখানে বলা হয়, মানুষ যদি তার এই জীবনকে গৌরবান্বিত মহিমায় উজ্জ্বল করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই নৈতিক জীবন যাপন করতে হবে। নৈতিকতা বিহীন জীবন যথার্থ মানবিক জীবন নয়। দৈহিক দিক দিয়ে একজন মানবাকৃতির হলেও যদি তার জীবন নৈতিক দিক দিয়ে মানোত্তীর্ণ না হয়

তাহলে সে প্রকৃত অর্থে মানুষ হয় না। অন্যকথায়, নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ প্রাকৃতিগত দিক দিয়ে মানুষ হলেও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে মানুষ নয়। কেউ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মায় না, নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে এটা অর্জন করতে হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, শীল বা সদাচারণ পালনের মাধ্যমে নৈতিক জীবনকে গঠন করতে হয়। প্রাণীহত্যা, চুরি, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা বা মিথ্যাচার মিথ্যা-ভেদ-নিন্দা-কুৎসা-পরচর্চা-নিষ্ঠুর-অনর্থক বাক্য, সুরাপান বর্জন ইত্যাদি গুন বিশিষ্ট রক্ষা কবচের মাধ্যমে নৈতিকতা অর্জন করা সম্ভব। এবং সর্বোপরি সংযমের আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার মধ্যেই নৈতিকতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযম বা সংহত করতঃ নৈতিকতা বর্দ্ধনের অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে সংযমের অভ্যাস শিক্ষা হলে প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি চিন্তা ত্রুটিহীন হবে। ত্রুটিহীন কর্ম, ত্রুটি হীন বাক্য, ত্রুটিহীন চিন্তাই প্রকৃত নৈতিকতা।

প্রজ্ঞা বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূল আদর্শ। জীবনের সফলতা ও পূর্ণতা আনতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন অপরিমেয়। বৌদ্ধ ধর্মের সব সাধনার মূল উদ্দেশ্য হল প্রজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করা। সাধনা ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার উদ্বোধন হলেই সকল দুঃখের উপলব্ধি ও নিবৃত্তি ঘটে। তাই দুঃখ ধ্বংসকামী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব প্রযত্নে প্রজ্ঞা সাধনায় নিযুক্ত হয়ে প্রজ্ঞার উদ্বোধন করা নিতান্ত কর্তব্য।

প্রজ্ঞা সাধনা বিহীন ব্যক্তির প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। প্রজ্ঞা উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত না হলে দুঃখ হতে নিবৃত্তি তথা দুঃখ মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

বুদ্ধ বলেছেন- 'জানাতি ইতি বিজ্জা (পঞ্ঞা), বিসেসেন জানাতী'তি বিজ্জা'। - প্রতিটি মুহূর্তেকে বিশেষভাবে জানাই বিদ্যা বা প্রজ্ঞা। অর্থাৎ অকুশলকে (লোভ, দ্বেষ, মোহ) অকুশল, কুশলকে (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) কুশল রূপে সম্যকভাবে জানাই প্রজ্ঞা। তাই প্রজ্ঞা লাভেচ্ছুককে তার সকল প্রকার কায়ের দ্বারা কৃত কর্ম, বাক্যের দ্বারা কৃতকর্ম, মনের দ্বারা কৃতকর্ম সমূহকে বিশেষভাবে জেনেই করতে হবে (With attention) এটাই প্রজ্ঞা। এইরূপে সম্যকভাবে জেনে অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপাদন চেষ্টা, উৎপন্ন অকুশলের ক্ষয় সাধনের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদনের চেষ্টা ও উৎপন্ন কুশলের স্থিতি, সংরক্ষণ, বৃদ্ধি, বৈপুল্য এবং পরিপূর্ণতা করার চেষ্টাকে প্রজ্ঞা সাধনা বলা চলে। এই প্রজ্ঞা সাধনা যার বর্দ্ধিত হয় তার প্রজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তজ্জন্য একজন প্রজ্ঞালাভী মানুষের হৃদয়ে যখন প্রজ্ঞার উজ্জ্বল আলো ভেসে উঠে, তখন জগতের সার-অসার, নিত্য-অনিত্য, সুখ-দুঃখ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি সব

গোপন রহস্য তার প্রজ্ঞার আলোকে ধরা পড়ে।আর উক্তরূপে যিনি প্রজ্ঞা শক্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সহ সব কিছুতে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম দর্শন করতে সক্ষম হন তিনিই প্রজ্ঞাবান বা জ্ঞানী। এই জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সম্যক দর্শনের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত ধর্মাস্বাদ লাভ করা সম্ভব, এবং শুধুমাত্র তখন থেকেই সে এজকন আসল বৌদ্ধ বা বুদ্ধ ধর্মালম্বী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

বৌদ্ধ ধর্ম সার্বজনীন, সার্বদেশিক, সার্বকালিন এবং সর্ব হিতকামী ধর্ম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধ তার ধর্মে স্থান, কাল, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় মানেননি। মানেননি রাজা-মহারাজা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ধনী গরিব, উচ্চ-নীচ ইত্যাদির শৃঙ্খল। তিনি সর্ব সাম্প্রদায়িক তথা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, দেশে-দেশে প্রভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনার্থে বা দুঃখের কবল হতে নিবৃত্তির জন্য তার ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। তার ধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কোন প্রভেদ নেই। তাই তার শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ব্রাহ্মণ, আনন্দ, অনুরুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয় (রাজবংশীয়), যশ প্রমুখেরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ বণিক সম্প্রদায়ের, উপালী ছিলেন জাতিতে নাপিত। তদ্রুপ তার ভিক্ষুনী শিষ্যাদের মধ্যে এবং উপাসক, উপাসিকাদের মধ্যেও সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের লোকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ছোট, বড় (সকল) নদীসমূহ যেমন নানা দিক বিদিক থেকে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় এবং তাদের স্বতন্ত্র স্বত্ব ও নাম হারিয়ে ফেলে, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতির মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করা মাত্র তাদের পূর্ব নাম ও গোত্র তথা পরিচয় হারিয়ে ফেলে। সুতরাং ভগবান বুদ্ধের কৃপালাভে কেউ বঞ্চিত হয়নি এবং এখানে (বৌদ্ধধর্মে) সকলের সমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। বস্তুত বুদ্ধ সকল প্রকার শ্রেণী বিভাগ মূলোচ্ছেদ করে, যে সমস্ত নিয়ম পালন করলে জীব জগতে কল্যাণ হয়, সুখ-শান্তি আসে, অনাবিল শান্তি ও সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় সে সমস্ত নিয়ম পালন করার উপদেশই দিয়েছেন।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য

সংগ্রহে- শ্রীমৎ সৌর জগত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

অভিশপ্ত সংসার জীবন। জীবনের শেষ নেই, আশার তৃপ্তি নেই, ভোগের অন্ত নেই। একমাত্র ভোগ বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্য মানবের কত আয়াস কত প্রয়াস। অতৃপ্ত তৃষ্ণা বাসনা পরিপূরণের জন্যে সংসার পথিক অভিশপ্ত জীবকে একটা বিদ্যা অবলম্বন করতে হয়- ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-কারিগরী, শিক্ষকতা, সামুদ্রিক গননা, নাচ-গান ক্ষেত-খামার, পশু পালন অথবা যে কোন একটি বিদ্যা। জীবন ধারন যেমন দুঃখময়, জীবন পরিচালনা ও তার চেয়ে দুঃখ কম নয়। সংসারে যে যতদুর পরিশুদ্ধ জীবন পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। তার জীবন ততদুর সুন্দর সুশৃংখল ও উন্নত হয়। ভোগে তৃপ্তি নেই, পূর্ণতা নেই। ভোগী চায় তার ধনভান্ড পূর্ণ হোক, রাজা চায় তার রাজ্য আরো বৃদ্ধি হোক, আর গরীব দীন দুঃখী চায় সে দু'মুষ্টি অন্ন পেট ভরে ভোজন করুক। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সংসারে তাদের কোন আশাই পূর্ণ হয়না। একমাত্র স্ত্রীপুত্রের ভরন পোষনের জন্য গৃহস্বামীকে তপ্তরোদে পুড়ে ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজে, হাড় কাঁপা শীতে হিম ঠান্ডা খেয়ে দুই পয়সা অর্জন করতে হয়। ইহা কত বড়ো অভিশাপ। সংসারে প্রবিষ্ট মানুষ সর্ববিদ্যা জাহির করার পরও যখোন কিছুর মধ্যে কিছু করতে পারেনা, অবশেষে পাপ পূন্য, ধর্ম-অধর্ম সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে স্বর্গ নরক, ইহ-পরলোক উপেক্ষা করে চুরি ডাকাতি করতে আরম্ভ করে। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি দুষ্কর্মের যে একটা কটু পরিনাম ফল ভোগতে হয়, সেই পবিত্র জ্ঞান তখোন তাদের উধাও হয়ে যায়, তাদের শুধু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে যখন কিছু করে পারলামনা, চুরি ডাকাতি করে হলেও স্ত্রীপুত্র পালন করতে হবে। এই চুরি কর্মের ফল স্ত্রী পুত্রেরা তো নিতেই পারেনা। তবুও মায়াময় সংসারের প্রতি কি যেন একটা প্রাণের আকর্ষণ। কর্মের তারতম্য অনুসারে সংসারে অসংখ্য প্রাণীর বাস। কেহ ধনী, কেহ শ্রেষ্ঠী, কেহ রাজা, কেহ দীন, কেহ পন্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সুখী, কেহ পথের ভিখারী। কেহ দোর্দন্ড প্রভাব চালাচ্ছে, কেহ রাজ পালংকে দুগ্ধ ফেন নিভ সুখ শয্যায় শয়ন করছে। কেহ পথের ধারে গাছের তলায় দিন রজনী অতিবাহিত করছে, কেহ পেট ভরে খেয়ে আনন্দ ফুর্তিতে নাচে গানে মগ্ন রয়েছে আর কেহ ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে মরছে। যারা ধনে সম্পদে নিজকে মহাধনী ও মহাসুখী বলে বিবেচনা করে। তারা তখন ধন গৌরবে

আপন সত্ত্বা হারিয়ে বসে এসব পার্থিব ধন নিয়ে যদিও শ্রেষ্ঠী মহাজনেরা আত্ম গৌরব করে তা অতি ক্ষনস্থায়ী এবং তা জীবনের পক্ষে একান্তই পরিহানি মূলক। পক্ষান্তরে যারা শ্রদ্ধাশীল ত্যাগ, শ্রুতি, প্রজ্ঞা, স্মৃতি, বীর্য প্রভৃতি ধনে ধনশালী, তারা বুদ্ধের দৃষ্টিতে অবশ্যই ধনী। এই ধনের যথেষ্ট মূল্য আছে। মানব জীবনে এরূপ পরমার্থ ধনে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা খুবই স্বল্প। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা, শীলের প্রতি অনুরাগ, ত্যাগে আত্ম বিশ্বাস, শ্রুতিতে দৃঢ়প্রত্যয়, প্রজ্ঞায় বলশালী, স্মৃতিতে নৈপুন্য, বীর্যে পরিপূর্ণ মানুষ নিশ্চয় বিমুক্তির পথে অগ্রসর হয়। শ্রাবস্তীর জেতবন। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী। সেই শ্রাবস্তীতে সুপ্রবুদ্ধ নামে এক দীন দরিদ্র কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি বাস করতো। সে বিত্ত সম্পদে ছিল অতিহীন, অতিদীন কিন্তু পারমার্থিক ধনে ছিল ধনী। ত্রিরত্নের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অগাধ। সেচিন্তা করতো এই সংসারে ত্রিরত্নের শরণ ব্যতীত আর কোন মুক্তির উপায় নেই। একমাত্র ত্রিরত্নের শরনেই মানব জীবনের পরম শান্তি পরম শুদ্ধি, ভব দুঃখের অসহ জ্বালা, অন্তরের তপ্তদাহ, মানসিক কুপ্রবৃত্তি, চিত্তের কুঠিল দ্বন্দ্বনতি, জন্মের প্রবাহ গতি এবং ক্লেশ দায়ী রাগ দ্বেষ মোহের উপশমে সর্বমুক্তি লাভ করা সম্ভব। সুতরাং সে মনে করলো ভগবান ইদানীং শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন তিনি প্রত্যহ চারি পরিষদে ধর্ম পরিবেশন করেন যা আদি মধ্য অন্তে কল্যাণকর। চারি আর্য্য সত্য সমন্বিত শীল সমাধি প্রজ্ঞায় নিগূঢ় তত্ত্ব, অনিত্য দুঃখ অনাত্মার স্বরূপ। এরূপ কল্যাণ প্রদ ধর্ম শ্রবন করা আমার একান্তই উচিত। অতএব, সে একদিন বুদ্ধের দেশিত ধর্ম শুনে মার্গফল সাক্ষাৎ করে। সমাজে তাকে সবাই ঘৃনা করে, নিন্দা করে, তুচ্ছ করে। সমাজে তার স্থান নাই। কারণ সে দীন কাঙ্গাল মানুষ চির অভিশপ্ত। কিন্তু কিভাবে জানাবে ভগবান বুদ্ধকে? বর্তমান কলিযুগের চরিত্রহীন নিগুণ ধনী ব্যক্তিকে সবাই মর্যাদা করে সম্মান করে, গৌরব করে, কিন্তু শত শান্ত ভদ্র অমায়িক ও ধর্ম ভয়ে ভীরু হলেও তাকে কেহ গ্রাহ্য করে না। সে সকলের কাছে চির অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকে। তাই সে অদৃষ্টকে চিরদোষী করে। সমাজ গুণী হলে গুনজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই আদর সম্মান লাভ করে। অপর দিকে মানুষের প্রাপ্য আদর স্নেহ, নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি কাদা সমতুল্য তৎদ্বারা কেহ স্বর্গ মোক্ষ লাভ করতে পারে না বা স্বর্গ মোক্ষ লাভের কারণও হয়না। কুষ্ঠ রোগী সুপ্রবুদ্ধ কোন গুণে গুণীয়ান ছিল, তা সমাজে কেহ তলিয়ে চায়নি।

দীন দরিদ্র সুপ্রবুদ্ধ যে শুধু তদানীন্তন সমাজে অবহেলিত ছিল তা নয়, বর্তমান সমাজেও অনেক দ্বীন দরিদ্র। শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাবতী দায়ক দায়িকারাও নর পাষন্ডের মানুষের কাছে উপহাস্য পাত্র হয়ে থাকে। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করলো- একে

পরীক্ষা করতে হবে। এ মানুষের মধ্যে অতিহীন, অতিদীন, সমাজের কাছে ঘৃনিত নিন্দিত ও অবহেলিত। পার্থিব সম্পদের প্রতি এর কতটুকু আকর্ষন এবং ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা কতদূর? তাই পরিষদের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তার কানে কানে বললো- 'হে সুপ্রবুদ্ধ, তুমি অতি দরিদ্র দিনান্তেও তোমার আহার জুটেনা। তাই হিতৈষী হয়ে আমি তোমার প্রচুর ধন দিতে সংকল্প করেছি। যা দ্বারা তুমি এ সংসারে সুখে চলতে পারবে। তবে তার বিনিময়ে একটা শর্ত মেনে নিতে হবে, তা হলো- জগতে বুদ্ধ ধর্ম সংঘের কোন মাহাত্ম্য নেই। এই নিগুন ত্রিরত্নের দুর্নাম প্রচার করতে পারবে কি?' দেবরাজের কথা শুনে সুপ্রবুদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলো, 'এজগতে সবচেয়ে তুমি মহামূর্খ। তোমার সমান হীনপুরুষ এই সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। তুমি মনে করতে পারো আমি মানুষের মধ্যে অতিহীন, অতিদীন। বিশেষ করে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু আমি প্রভু বুদ্ধের কৃপায় মার্গফল সাক্ষাৎ করেছি। আমার অসংখ্য জন্ম প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে সাত জন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। তাই আমি পরম শান্ত। আমার অন্তর আর্যধনে পরিপূর্ণ।' ইন্দ্ররাজ সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করলেন। অতঃপর সুপ্রবুদ্ধ ভগবান তথাগতকে আপন মার্গফল লাভের কথা ব্যক্ত করে বললেন,- 'তথাগতের বোধির প্রতি যার অটল শ্রদ্ধা, কল্যান প্রদ আর্য প্রশংসিত শীলের প্রতি যার অনুরাগ, ধর্মলাভী সংঘের ঐকান্তি প্রসাদ, সে কখনো দরিদ্র হতে পারে না। তার জীবন আর্য বিনয় মতে অমোঘ বা শ্রেষ্ঠ। এই জগতে অন্যান্য পার্থিব সম্পদে সম্পদশালী ব্যক্তির চেয়ে আর্যধনে সমন্বিত ব্যক্তিই মহাধনী' শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন,- 'ত্রিরত্নের প্রতি বিশ্বাস, চতুঃসত্য ও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস যার আছে সে কখনো দরিদ্র হতে পারে না।'

মানেই লগর জাগি উদিবার কিজু কদা

শ্রীমৎ ভদ্দজী স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

এই পিথিমিত যিদুক্কুন প্রাণী আগন, বেগত্তুন বেজ দোল প্রাণী অলাক্ষে, এই পিথিমির মধ্যে মানেই। মানেইলক বেগত্তুন বেজ্ অজল ডাঙর দোল কিত্যাই? গদা পিথিমির প্রাণীউনে-দ যাদগে তারে দোল লাগে। মানেই লগরে, কাবরে, সোবরে, কদা বাত্তায়, শীল পালানাই, জ্ঞানে, বুদ্ধিয়ে, নীতি শিক্ষায়, রূপে রঙে, দগে দাগে, বেক্ষানিত উনো নেই কিনেই। দোল পান, দোল দেগন। সিত্যায়, আমা, ভগবান গৌতম বুদ্ধ ইয়ো বাইনী গুচ্ছে। বাইনী গুচ্ছ্যা মানেই কুলত, রাজা শুদ্ধধন ঘড়ত জন্মেইয়্যেগী। তে, রাজার পোয়া ওই নেই বেক্ষানি উনো-নেই গুড়ি পেইয়্যে। এদক, রাজার রাজ্য ধন সম্পত্তি উনো-নেই গুড়ি পেনেই ও সুখ নগরে, সিয়ানি সুখ নদেগে, দুঃখ দেক্ক্যে। সিত্তুন বেজ্ ন-ফুরোইদ্যে, অজর, অমর চিরসুখ নির্বান পেবাত্যাই। তে, মা, বাব, মোক, পোয়া, জ্ঞাতি কুতুম্ব, স্ব-সাগচ্ছ্যা, রাজার সুখ, পিথিমি সুখ বেক্ষানি সেবধক ফেলেই-দি, গোভীন ঝাড়ত যেই, নৈরঞ্জনা ইদু বট গাজত তলে বোঝিনেই, ভাত পানি ইরিনেই, ছ-বজর সং রম চক্রগুড়ি, মরাধক্ক্যা গুড়ি, ধ্যান-ভাবনা গুচ্ছে, তু-অ-তে, অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ ওইনপারে। তে, সেক্ষেনে, ভাবেত্তে, এদগ রমচক্রগুড়ি, মরা ধুক্ক্যাগুড়ি ধ্যান-ভাবনা গুড়িলুং, তু-অ সম্যক সম্বুদ্ধ ওই নপারিলুং। ইক্কিনে কি গুড়িম মুই, নাহি ঘড়ত ফিরিয়েম, ইদিক্ক্যাগুড়ি ভাবদে ভাবদে সেক্ষেনে ইন্দ্র রাজা বীনা বাজেই উজ্ আনি-দিবেত্তেই, ব্রাহ্মণ রূপ ধুরী ইচ্ছে। ইন্দ্র রাজা পোইল্যা বীনাবো করকজ্ গুড়ি বাজে শুনেল। তাপরে-দি আরহ্ ভারী দোল গুড়ি বাজেই শুনেল। ইন্দ্র রাজা আরহ্ একবার জোগাচ্ছ্যা দোল মিধে মিধে র-অ গুড়ি বাজেই শুনেল। ইন্দ্র রাজা ইদিক্ক্যা গুড়ি তিনবার তিন বাবত্যা গুড়ি বাজেই শুনেই দেই-যেয়েগোই। ইদিক্ক্যা গুড়ি তিনবার তিন বাবত্যা বীনা র-অ শুননার পর তা, মনানত ইদিক্ক্যান ভাজি উদিল। বেজ রমচক্র গুড়ি মরাধুক্ক্যাগুড়ি ধ্যান-ভাবনা গুড়িলেও ন-অব। বেজভারী ঢেল গুড়ি ধ্যান-ভাবনা গুড়িলে ও ন-অব। জোগাচ্ছ্যা মধ্যম গুড়ি ধ্যান-ভাবনা গড়া পুড়িবো। ইদিক্ক্যান গুড়ি ভাবদে ভাবদে তে, নৈরঞ্জনাত গাদি-গাদায় গাজত তলে বোঝি, তে, কল, ইচ্ছ্যাত্তুন দুরি মধ্যম গুড়ি ভাত পানি হেম।

রমচক্র ন-অ গুড়িম। মধ্যম পদে চলিম।

সিদিন্ন্যা সুজাতা পায়স দান দেগোই। সুজাতা পায়স চান ৪৯ গরাজ হেই, দরমর ওই সিদিন্ন্যা রেদোত, অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ ও ই-ইয়্যে। অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ ওই সুগে এ উদান গাথাবো হোইয়্যে।

"কোথায় যে কতভাবে জনম নিয়েছি,
জন্মমৃত্যু শোকতাপ কত সয়েছি।
নিদারুন দুঃখ তাপে জর্জরিত এই প্রাণ।
জ্ঞান বলে মুক্ত আজি গাই মুক্তির গান।
বাঁধিতে পারিবে না-আর দুঃখ কারাগার।

বুদ্ধ অনারপর আরো ভাত পানি ঘুম ত্যাগ গুড়ি, তে, বুদ্ধ ওই-ইয়্যেদ্যে, জাগা-গান, আরো চেরকিত্ত্যা-দি মোট সাত্তান জাগাত এক সাপ্তাগুড়ি মোট ৪৯ দিন সং, ধ্যান-ভাবনা সুগত এল। সে সাত্তান জাগারে সপ্ত মহাস্থান কন। ৪৯ দিন অনার পরেদি আরো একবার নৈরঞ্জনাত গাদি গাদায়, গাজত তলে বল পেই-ইয়া সুখ গড়ের। সেক্কেনে তপসসু ও ভল্লিক নাঙে দ্বিজন বেয়্যারী, ভগবান বুদ্ধর কেই-ইয়্যেত ছদক দেগি গোত্তীন শ্রদ্ধায় তারা ভগবান বুদ্ধরে পিধা (বিস্কুট) দান দিলাক। বুদ্ধত্তুন এক্কেনা ধর্ম কদা শুনি, তারা বুদ্ধ আর্ তার ধর্মর আশ্রয় লোই যিয়োন্দোই।

তারা দ্বিভাচিক ভিলি তারার নাঙান পিথিমিত ছিদি আগে। সে পরেন্দি ভগবান বুদ্ধর দোদুল্যামন ওই-ইয়ো। কারণ ভগবান বুদ্ধর নিগুজ ধর্মকদা অজ্ঞান মানেই-ইয়্যে বুঝি ন-পাড়িবাক্। সহম্পতি ব্রহ্মা বুদ্ধরে কয়-দ্যে ভগবানে মানেই-ইয়োরে যিদ্দুর অজ্ঞান দেক্যে সিদ্দুর নয়। বুঝি পারন পারা সেদক্যা জ্ঞানী পন্ডিত প্রাণী ও পিথিমিত আগন। সে পরেন্দি আরাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকরে দিব্যচোগে রিনি চেই, তে, দিগিল তারা পিথিমিত নেই। সে পরেন্দি আরহ্ রিনি চেল, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগুন কুদু আগন। ভগবানে দিব্যচোগে দিগিল্ তারা চংক্রমন ঋষিপতন মৃগদাবত আগন। সে পরেন্দি সারনাদমোক্যা যা ধুরিলো। পধ্ মধ্যে উপকনাঙে একজন মানেই লাগত পেল।

উপকে কত্যে শ্রমনর মু-আন-দ ভারী দোল,
দিব্য ছদক দেখা যার। তুই নিশ্চই হিজু পিইয়জ।
তুই কন মতবাদী? ত-গুরু কন্না?

ভগবান কল, মত্তুন কন্ গুরু নেই? মুই নিজেই বুদ্ধ।

উপকে কল,অলেও ওইপারে।

এ কদাগান হোই তে, যিয়্যে গোই।

বুদ্ধ যক্ষে সারনাদত পঞ্চবর্গীয় শিষ্য গুনোকায় লুণ্ডি লোগোই, সক্ষে দুরত্তুন বুদ্ধ এজ্জের দেগি তারা হদন্দে- ঐ ভন্ড ব্রত তপসী- বো, ভোগী বো এজ্জের। কন জনে তারে আগ্ বাড়েই হজা ন যেবা। এলে হবাদে বোঝিবার জাগা আগে বোঝিলে ও বোঝি পারস। হালিক বুদ্ধ যেধক কুরে এজ্জের সেধক বেশ তারার মনান ফিরি যার।

কুরে এনেই হিয়্যে আগ্‌বাড়েই আনি ঠেংদোই-দে দন। হিয়্যে বোঝিবার জাগা যুক্কলাদন, হিয়্যে বিজোন বিজি-দে দন। ইদিক্ক্যা গুড়ি বুদ্ধরে যত্তন গড়া ধুচ্ছন। হালিক বুদ্ধরে, বুদ্ধ গুড়ি ন মাদেই যক্কে সমাজ্যা ধুক্ক্যা গুড়ি মাদা-দন, সক্কে বুদ্ধ তারারে তে, বুদ্ধ ভিলি জানেই "ধর্মচক্র প্রবর্তন সুত্র-বো দেশনা গুড়ি পোল্ল্যা আগ্ সাধত কোন্ডান্য অরহত্ত্ব ফল পেল। তাপরেন্দি আরহ্ "অনিত্য লক্ষণ সুত্রবো যক্ষে দেশনা গুড়িল বাগী চেরজনে ও অরহত্ত্ব অলাক। তে, উ-অ ধরানা আরাম্ভ অলহ্। সে লক্ষে মৃগদাব শ্রেষ্ঠীর পোয়া যশর সমারে হেইট জন অরহত অলাক। সক্কে তে ভগবান বুদ্ধুর সংঘ জন্মোলাক।

উ-অ ভাঙানার পরেন্দি বুদ্ধ বেগরে কল,

তুমি চের কিত্ত্যাদি ছ-ড়েই পর।

বেক্কুনর হিতসুখ মঙ্গলত্ত্যায়।

যক্ষে চের কিত্ত্যাদি ছড়েই পলাক্ সক্ষে-তে আজার আজার লাক লাক কোটি কোটি প্রাণীর ধর্ম জ্ঞান ও নির্বান সুখ ও ইয়্যে।

সিত্ত্যায় বর্তমান যুগর মধ্যে আয্য মানেই বনভান্তে ও ভগবান বুদ্ধ ধুক্ক্যা গুড়ি, তে-ইয়ো নানা বাবত্ত্যা জ্ঞানী পন্ডিত মানেই লগে এ্যাত্তর ওই তে পিজোর গুচ্ছে-দে বেগ দুগত্তুন হেনে পার অয়? নির্বান যে চিরসুখ অজর অমর সে নির্বান সুখ কেনে পা যায়। সে জ্ঞানান কেনে পায়।

ইদিক্ক্যা গুড়ি পিজোর গড়ানার উত্তরান কন জনে তারে কোই-দি ন পারন। কোই-দি ন পারানায়, তে গায় গায় গোভীন ঝাড়ত যেই ১২ বজর সং রমচক্র গুড়ি ধ্যান-ভাবনা গুড়িনেই, অরহত ওই নির্বান সুখ গুড়ি তে ঝাড়ুহ্ বিদিরেত্তুন বারে নিগিলি এই, বেগর হিতসুখ মঙ্গলত্ত্যায় নির্বান ধর্ম গান দুল পিদি দিবেত্ত্যায়,

দিনে-রেদে মানেই লগরে ঘুমত্তুন জাগার। জাগাদে জাগাদে কন কন জনে অঘুর ঘুমত্তুন ঝাগি উদি বাগী ঝাগ্ ধক বনভান্তে ইদু এথোন যাদন, বনভান্তে কত্তে এদক-কি এজর-ঝ-অর, ম-সমারে থাগনা অজর অমর চির সুখ নির্বানত যেই। মানেই লগর কিজু ঘুম ভাঙি চোখ-মু পুজি পুজি আগন। কিজু ঘুম ভাঙ্যা মানেই লোই, বনভান্তে অজর অমর চিরসুখ নির্বান ধর্ম আদত্ লোই চের কিত্যা-দি দুল পিদিপিদি অঘুর ঘুমত্তুন জাগার। সে-দুলহ্-রই অঘুর ঘুম ভাঙি বিদিং বাদাং উদি এই, বন ভান্তেরে কদন্দে আ-তর কি অইয়্যে-দে, দুল বাজেই বাজেই মানেইয়োরে ঘুমত্তুন জাগর। তুই কি দুল পিদি দত্তে। বনভান্তে কত্তে, মুই অজর অমর চির সুখ নির্বান যেবাত্যায় দুল পিদি দোগুর। ঘুম জিইয়্যা মানেইয়্যে কদন্দে, তর কি কপাল পুরেস্তে এদক কি হিজে কিচ্ছে গড়ানা। এব পহ্র ন-অয়। যক্কে পহ্র অব, সক্কে তে নির্বানত যেবং। ইক্কনে রে-দে বিলিমায় কুদু যেবং। বনভান্তে কত্তে, তোমারে কন্না কত্তে, রেইট বিলি, এব-দ বেলান ন-দুবেগোই। এক্কেনা গুড়ি বেলান আলে-ইয়্যে-দে। তুমি-দ দিনত, ঘুম যত্ত্যে। তোমার যেক্কে রোদ বিলি মায় জাগি বাগোই, সেক্কে তুমি নির্বানত যে নপাড়িবা। সময় থাক্কে জুগুলে-ল, নলেন তুমি বিবদত পুরিবা, কোই, যারা যারা এ ক্কেনা এক্কেনা ঘুমভাঙিনেই, চোখ মিলি রিনিচেই, কন কন জনে কদন্দে অয়-দেনা, ভজমান পহ্র আগে-দে কোই, জাগাজাগি গুড়ি ঘুমত্তুন উদি বাগী পালহ্ ধক, এত্তন বনভান্তে মুখ্যা। এইনেই কদন তারা আমিও যেবং নির্বানহ্ মুখ্যা। চাংমা কদাদি যেদক্কানি জানি পাজ্জ্যা জানি ন পাজ্জ্যা ভগবান বুদ্ধর ধর্মকদা, আ-বনভান্তের ত্যাগ ধর্মকদা-আ-মানেই লগরে দাগেত্তে সে কদা বানা মুলুক মুলুক কদানি লো-নেই মুই তোমা বেক্কুনরে গোক্কেই দিলুং। তোমা বেগর মঙ্গল ওক, সুখ ওক নির্বানহ্ জ্ঞানান যা-দি ফুদি উদোক, এই আশীবাত্তান গুড়ি ম-ধর্ম কদা-গান ইয়োত থুম গুড়িলুং।

সাধু - সাধু - সাধু।।

সত্যের সন্ধান

শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু
কাচালং এরিয়া
সারোয়াতলী অরেণ্য কঠির। ধুতাঙ্গ।

উপোসথ; এই অধ্যায়ে প্রধান উপজীব্য উপোসথ। উপোসথ শব্দ সম্ভবতঃ উপবাস হইতে গৃহীত। শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের প্রারম্ভে এই উপোসথের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কথিত আছে মগধরাজ বিম্বিসারের অনুরোধেই ভগবান বুদ্ধ উপোসথের প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে এই উৎসব কেবল দায়ক-দায়িকাদের একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনা সুযোগ প্রদান করে, তাহা নহে, ইহা সুষ্ঠু ধর্মীয় জীবন-যাপনের ও উপযোগী হয়। পূর্ণিমা-অমাবস্যা, অষ্টমীতে উপবাস করা এই দেশের চিরাচরিত প্রথা। দৈনন্দিন দুই বেলা আহার মানব মাত্রেরই নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাময়িক উপবাসের দ্বারা শরীরে খাদ্য-দ্রব্যের উপযোগিতা কতবেশী তাহা অধিকভাবে উপলব্ধ হয়। তাই অনেকের নিকট উপবাসই উপসথের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের জন্য উপোসথের প্রবর্তন বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কথিত আছে পূর্ববর্তী সম্যক বুদ্ধ গণ ও উপোসথ ব্রতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ শূন্য কল্পে ও একপ্রকারের উপোসথ "সোমরস" উৎসবে পালন করা হইত। উপোসথ শব্দটি মূলতঃ উপবাস হইতে গৃহীত হইলেও বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার অর্থ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টমী অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাকে উপোসথ দিবস বলে। ঐদিন উপাসক-উপাসিকারা মন্দির ও বিহারে যাইয়া ত্রিশরণের শরণাপন্ন হইয়া অষ্টশীল পালন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাবান উপাসক ও শ্রদ্ধাবতি উপাসিকারা সকল সময় পঞ্চশীল পালন করিলেও ঐ দিবস গুলিতে অষ্টশীল অথবা দশশীল পালন করেন। উপোসথিগণ উপসথ গ্রহণ করিয়া জাগতিক ভোগ সুখের কথা ত্যাগ করিয়া চলেন। তাঁহারা সব সময় বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি সংঘানুস্মৃতি চতুর অপ্রমেয় ভাবনায়রত হইয়া সময় ক্ষেপন করেন। তাঁহারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াশীল ও হিতাকাঙ্খী হন।

তাঁহারা কদাচিৎ মিথ্যা ভাষন করেন না, তাঁহারা সর্বদা সত্য ভাষন করেন। নৃত্য-গীত, বাদ্য-মাল্য, সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন, ধারণ ও মন্ডন হইতে বিরত হন। তাঁহারা বিকাল ভোজন পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা উচ্চ শয়নাসন ও বহু মূল্য আসবাব

পত্রের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া তৃন শয্যায় শয়ন করেন। এইরূপ আর্য্য উপোসথ পালনের নিম্নরূপ ফল বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি অথবা সূর্যের সমুজ্জ্বল কিরণ কোনটাই শীল গুনের সহিত তুলনীয় নহে। সসাগড়া ধরণীয় মুনি মানিক্যাদিসহ ধন-রত্ন এমন কি স্বর্গের দিব্য ঐশ্চর্য ও অষ্টাঙ্গ উপোসথের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। উপোসথ শীরের অনাবিল দীপ্তি চন্দ্র সূর্যের কিরণ, মনি-মানিক্যের উজ্জ্বল প্রভা দেবতার দিব্য জ্যোতি সব কিছুকে শীল গুন পরাস্ত করে। স্বর্গীয় আনন্দ উৎকৃষ্টতর হইলেও ক্ষনস্থায়ী উহা হইতে পতনের ভয় বর্তমান, কিন্তু শীল সৌরভ অবিনশ্বর, চির শান্তি দায়ক। উপোসথ গৃহস্থদের ধর্মীয় জীবন-যাপনের প্রধান উপজীব্য হইলেও পরবর্তী কালে এই উপোসথ ভিক্ষু সংঘের ও অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় উপোসথ ব্রত গ্রহণ উপলক্ষে ভিক্ষুদের পাতিমোক্‌খ পাঠের সূত্র পাঠ হয়। এই পাতি মুক্‌খ পাঠকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাপদ সমূহের আলোচনা, পারাজিকাপ্রাপ্ত ভিক্ষুর বহিঃস্কার, সংঙ্ঘাদিসেস আপত্তির প্রতিকার। পাচিত্তিয়া দেশনা, অপরাধী ভিক্ষুর বিচার, পরিবাস, মানওও মুলায় পাট কম্মনা আহ্বান কর্ম্ম নিস্মরকর্ম পববাজনীয় কর্ম্ম, পটিসারণীয় কর্ম্ম, প্রবারণা, কঠিন চীবর দান প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা এই উপাসথাঘারেই হইতে থাকে। পাক্ষিক উপসথ ও আপত্তি দেশনার পরেই সাধারণতঃ এই সমস্ত আলোচনা আরম্ভ হয়। এই পাতিমোক্‌খ সভাতে ভিক্ষুদের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক ছিল।

এমন কি কোন ভিক্ষু রুগ্ন হইলে খাটিয়াতে করিয়া হইলেও এই সভাতে উপস্থিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে দৃষ্ট হয়। নতুবা কোন ভিক্ষুর মাধ্যমে তাঁহার পরিশুদ্ধি ঘোষণা করিতে হয়। বিনয় পিটকের মধ্যে পাতিমুকেখা আবৃত্তি সম্পর্কীয় বহু ঘটনায় ভরপুর।

বর্ষাবাস

এই অধ্যায়ে ভিক্ষু সংঘের বর্ষাবাস উদযাপনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বর্ষাবাস অর্থাৎ বস্‌সাবাস বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনী, উপাসক-উপাসিকাদের একটি স্মরণীয় উৎসব। ইহা প্রতি বৎসর সমস্ত বৌদ্ধ দেশের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। শাক্য মুনি বুদ্ধের প্রতি সন্ধি গ্রহণ, সংসার ত্যাগ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের দীক্ষা এবং প্রথম ধর্ম্ম দেশনা এই দিনে সংঘটিত হয়। বৌদ্ধ মাত্রেরই এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহাছাড়া এই পূর্ণিমাতেই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বর্ষাব্রত আরম্ভ করেন। গৃহীদের মধ্যেও কেহ কেহ এই ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত ধ্যান সমাধি ও বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (অধিষ্ঠান) হন। বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন চীবর দান এই

তিনটি উৎসব পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। কারণ, রীতিমত বর্ষাবাস উদ্‌যাপন না করিলে কোন ভিক্ষু কঠিন চীবর গ্রহণ করিতে পারেন না। কঠিন চীবর গ্রহণ না করিলে ভিক্ষুগণ বহু প্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন। এই কারণে ভিক্ষু ও গৃহীদের নিকট ইহা অতীব প্রয়োজনীয় ব্রত। বর্ষাব্রত গণনা করিয়াই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বয়স স্থির করেন। ইহা ছাড়া বর্ষা ব্রতের অন্যরূপ উপযোগীতাও কম নহে। এই বর্ষা ব্রতকে উপলক্ষ করিয়া পরবর্তীকালে ভিক্ষুদের বাসের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, শিক্ষা-ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে যাইয়া বুদ্ধকে বহু নতুন নতুন নীতির প্রবর্তন এবং পুরাতন নীতির সংস্কার সাধন করিতে হয়। মহাবগ্‌গে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সম্পর্কীয় বহু প্রকার বিধি নিষেধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিনয় মতে বৎসরকে চার ভাগে বিভক্ত করা হইত। যথা- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত।

চৈত্র-বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু। আষাঢ়, শ্রাবন ও ভাদ্র এই তিন মাসকে বর্ষা ঋতু বলে। বিনয়ের নিয়মানুসারে ২৭ দিনে এক নক্ষত্র মাস। সূর্য মাস চান্দ্র মাসের তুলনায় বড়। সৌর বৎসরের সহিত মিল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ৩২ মাস অন্তর অন্তর একটি মল মাস হয়। অর্থাৎ যেই বৎসর মল মাস হয় সেই বৎসর ১২ মাসের পরিবর্তে ১৩ মাসের এক বৎসর হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত ভিক্ষুগণ বর্ষাব্রত পালন করেন। এই সময় ভিক্ষুগণ এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরি না করিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া অধ্যায়ন, অধ্যাপনা ও ধ্যান-ধারনায়রত থাকেন। কোন কার্য বশতঃ একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইতে হইলে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সংঘ অথবা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য ছাড়াও বাস স্থানে বন্য জন্তু, সাপ, দস্যু ডাকাতের উপদ্রব অথবা বাসস্থান জল-অগ্নি অথবা ঝটিকায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে বর্ষাবাস ভঙ্গ করা বিধেয়। বিহারে দায়ক-দায়িকা অত্যধিক ঝগড়াটে ও তর্কপ্রিয় হইলে বিহার ত্যাগ করা দূষনীয় নহে। সংঘের উদ্দেশ্যে নিম্নের যে কোন একটি নির্মানের জন্য- (১) বিহার, (২) অড়চযোগ, (৩) প্রসাদ, (৪) হর্ম, (৫) উপাঠ্‌ঠান শালা, (৬) অগ্‌গি শালা, (৭) কপ্পিয় কুটী, (৮) চঙ্কমন কুটী, (৯) গুহা, (১০) পরিবেন, (১১) কোট্টাগার, (১২) চঙ্কমন শালা, (১৩) কূপ, (১৪) কূপুহ, (১৫) পুষ্করীনি, (১৬) মন্ডপ, (১৭) আরাম, (১৮) আরাম নির্মাণের স্থান। গৃহস্থগণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য পূর্বোক্ত রূপ স্থানগুলি নির্ম্মাণ করিবার সময় ভিক্ষুর উপস্থিতি কামনা করিলেও এক সপ্তাহের জন্য বর্ষাবাস ভঙ্গ করা যায়। উপরে উল্লেখিত কারণ ব্যতীত বর্ষাবাস ভঙ্গ করা বিধেয় নহে। পরিব্রাজকদের

ন্যায় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষের কোটরে অথবা বড় জালার ভিতরে বর্ষবাস গ্রহণ করিতে পারেন না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগনকে উপযুক্ত স্থানে বর্ষাবাস গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দান করিয়াছেন। মহা বগ্‌গে বলা হইয়াছে, যেখানে উপযুক্ত দায়ক-দায়িকা বর্তমান পড়াশুনা ও ধ্যানাভ্যাসের কোন অসুবিধা নাই, সেই স্থানেই বর্ষাবাস গ্রহণ করা উচিত। তবে নিকায়ের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে, যেমন- গয়া, উরুবেলা, রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলিপুত্র, এক নালা, শ্রাবস্তী, সাকেত, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে বর্ষাবাস যাপনের জন্য উপযোগী গুহা আবাসের মধ্যে গৃধ্রকুট চোর প্রপাত, ইসিগিলি, সপ্তপর্নী, সীতবন, সপ্পসণ্ডিক প্রভার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ষাবাসের সময় সমাধি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত স্থান হইল গোতমক, কন্দর তিন্দুক, তপোদারাম, তপোদাকন্দর, ইন্দশালা, বর্ষাবাসের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত সংঘ বাসের মধ্যে জেতবন, পূর্বরাম, রাজ কারাম, অন্ধবন অঞ্জন বন, কালকারাম, সুঙ্গবন, ঘোসিতা রাম, ন্যাগ্রোধারাম এবং বাংলাদেশের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পরম সুহৃদ লৌকিক ও লোকত্তর মার্গে অন্যতর পথ প্রদর্শক, জ্ঞান তাপস, মুক্ত পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তে রাঙ্গামাটি রাজ বনবিহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য।

প্রবারণা

সংস্কৃত প্রবারণা শব্দ হইতে প্রবারণা শব্দের উদ্ভব। ইহা অর্থ আশার তৃপ্তি, অভিলাষ পূরণ শিক্ষা সমাপ্তি অথবা ধ্যান শিক্ষা সমাপ্তি বুঝায়। বর্ষাব্রত পূর্ণ হইবার দিনে আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে ইহা উদ্‌যাপিত হয়। প্রবারণাকে বুদ্ধের আনন্দের দিন বলা যায়। কারণ ঐ দিনই ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতের অবসান হয়। ইহাতে উল্লেখ আছে বুদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এইরূপ কোন প্রবারণা উদ্‌যাপনের রীতি প্রথমে প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেত বন মহা বিহারে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন কৌশল হইতে একদল ভিক্ষু বর্ষাবাস অবসানের পরে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়। বুদ্ধ তাহাদিগকে কিভাবে বর্ষাবাস উদযাপন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলেন যে, তাঁহারা পরস্পরের সহিত কোন কথা না বলিয়াই বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য চলিয়া আসিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের ঐরূপ কথা শুনিয়া তাহাদিগকে মৃদুভাবে তিরস্কার করেন। তাহাদিগকে বলেন ভিক্ষুগণ তোমাদের এই রূপ আচরণ প্রশংসা নহে। ভিক্ষুগণ ভিক্ষুসংঘ এক স্থানে বাস করিতে গেলে বহুবাদ বিসংবাদ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বর্ষা বাস সমাপ্তির পর তোমরা একত্র হইয়া প্রবারণা করিবে। পরস্পর পরস্পরের দোষ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তোমার যেমন দোষ ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নহে, সে রূপ অপরের দোষ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এক স্থানে থাকিবার

সময় পরস্পর পরস্পরকে অনুশাসন করিলে উভয়েরই মঙ্গল হয়। শাসন পরিশুদ্ধ হয়। ইহাতে সমগ্র ভিক্ষু সংঘের উন্নতি সাধিত হয়। ইহার পর ভগবান ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করিয়া বাধ্যতামূলক প্রবারণা প্রবর্তন করেন। প্রবারণা দু প্রকারঃ পূর্ব কার্তিক ও পশ্চিম কার্তিক প্রবারণা আষাঢ়ী পূর্ণিমা বর্ষাব্রত আরম্ভ করিয়া আশ্বিনী পূর্ণিমার যে বর্ষাব্রত সমাপ্ত হয়, উহাকে পূর্ব কার্তিক প্রবারণা বলে। দ্বিতীয় বর্ষাবাসের পর যে প্রবারণা সম্পন্ন হয় উহাকে পশ্চিমী কার্তিক প্রবারণা বলে। ভিক্ষুগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে যে কোন এক প্রকার প্রবারণা উদ্‌যাপন করিতে পারেন। কোন অবস্থাতে প্রবারণা উদ্‌যাপন বন্ধ রাখিতে পারেন না। অবশ্য কোন অসুবিধা হইলে প্রবারণা কয়েকদিন বিলম্ব করিয়া উদ্‌যাপন করিতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিলম্বের মাত্রা এক মাসের অধিক হইবে না। বুদ্ধ কর্তৃক এইরূপ বাধ্যতামূলক প্রবারণা উদ্‌যাপনের নানা কারণ থাকিতে পারে। বহু ভিক্ষু একস্থানে অধিকদিন বাস করিলে বাদ বিসংবাদ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বাধ্যতামূলক প্রবারণার দ্বারা উহার পরিসমাপ্তি হয়। কারণ প্রবারণার পূর্বে পরস্পরের দোষ স্বীকার (আপত্তি দেশন) অবশ্য করণীয়। একসঙ্গে বিনয় কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ভিক্ষুদের সোহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। ইহাতে সংঘের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ইহা ছাড়া প্রবারণা উদ্‌যাপনের দ্বারা কঠিনোৎসব উদ্‌যাপন করিবার সুযোগ হয়। যথাযথভাবে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন না করিলে কঠিন চীবর দান করা সম্ভব নহে।

'বর্তমানে মানুষের জীবন অতীব ক্ষীণ। সুতরাং পুণ্যকাজে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখা একান্ত দরকার। ভবিষ্যতে মানুষের জীবন আরো ক্ষীণ হবে। এমন কি অদূর ভবিষ্যতে দশ বৎসর পর্যন্ত পরমায়ু হবে সে সময় পুণ্যকেই বুঝিতে পারবে না। পশুপক্ষী হতেও অধম হবে। হিংসা ত্যাগ কর, অজ্ঞানতা ত্যাগ কর। পুণ্য কর্মে নির্ভীক হও। সব সময় শীল পালন কর। ধর্মচারীকে ধর্মে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা অপ্রমাদের সহিত পঞ্চশীল পালন কর' - বনভন্তে।

সকল প্রাণী সুখী ও জ্ঞানী হোক।

সাধু - সাধু - সাধু।।

বুদ্ধের মূল উপদেশ

শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

মানব মাত্রেই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার। দেশ, কাল, পাত্র। এই তিনটি বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব সহকারে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সত্য এবং জ্ঞানের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ন্যায় নীতি প্রচার করতে হয়। তানাহলে মানুষ মাত্রেই ন্যায় নীতির অধিকারী হতে পারেনা। বৌদ্ধ ধর্মে তার মৌলিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কারক ভগবান বুদ্ধ এমন সময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন যখন দেশ হয় শান্তিময়, কাল হয় সুখময় এবং পাত্র বা দেশবাসী হয় জ্ঞানী আর ধার্মিক। যে দেশ জ্ঞানী ও ধার্মিক রাজা প্রজা ধারনের অধিকারী হয়, যে কাল সুখ সম্পত্তি সৃষ্টিক্ষম, আর যে পাত্রের কাছে থাকে ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দ দোষ-নির্দোষের বিচার ক্ষমতা, সে দেশ সে কাল এবং সে পাত্রের আনুকুল্যে সত্যের নীতি জ্ঞানে শাসন জগতের মাঝে বয়ে আনে সুখ, সমৃদ্ধি, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি। সে দেশ সে কুল সে জাতি হয় ধন্য গৌরবান্বিত।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই আদি অন্ত বিরহিত সংসারে কখনো সুখ আর কখনো দুঃখ প্রতিটি প্রাণী তথামানব সমাজের উত্থান পতনের এক বৈচিত্র্যময় গতিধারা বয়ে চলেছে- অবিশ্রান্ত ভাবে।

বর্তমান জন্মেও আমরা সবাই একই নিয়মে সুখ দুঃখের স্রোতে ভেসে চলেছি জীবন চলার গতি পথে। কারো জীবনে আসে সুখের বন্যা, কারো জীবনকে দুঃখ এসে করে গ্রাস। আট্ট হাসি হাসে তারা সুখের অধিকারী হয়, আর সর্বনাশী দুঃখ এসে কারো জীবন নেয় কেড়ে। কান্নায় অশ্রুর বান তখন তার কপালে।

এখানে চলছে শুধু সুখ-দুঃখের কাড়াকাড়ি। সেই সুখ-দুঃখ হচ্ছে এই পৃথিবী। কে এই জগৎকে অধিকার করে বসবে? সেই চিন্তায় মানুষ আজ মোহগ্রস্ত। অজ্ঞানে বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে মানব সমাজ পরস্পর পরস্পরের ধন সম্পত্তি লুন্ঠনে ব্যস্ত। একে অন্যের প্রাণ করছে সংহার। এতেকি সুখ শান্তি এসে মানুষের ঘর ভরছে? কারো কপালে কি কোনদিন ঝিঙেফুল ফুটছে? হোকনা কেউ রাজ্যের অধিকারী, নিয়ে থাকনা পরের সব ধন সম্পত্তি কেড়ে। তাতে কি অমরত্ব লভিবে সে জন? মৃত্যু কি তারে পৃথিবী থেকে নিবেনা কখন? তাই যদি হতো এই দুনিয়ায় পরের ধন হরনের সার্থকতা মিলতো।

আর অপরপক্ষে যারা সর্বহারা, নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ঘৃণিত তাহাদের জন্ম জন্মান্তরেও যদি একই অবস্থা থাকতো তবে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হতো। আসলে এ'দুনিয়ার এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই পৃথিবীর মানব সমাজের এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধগণ যুগে যুগে ধরা ধামে আবির্ভূত হয়ে সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানের শাসন নীতি প্রবর্তন করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানেও মিথ্যার রাজ্যে সর্বত্রই অজ্ঞানের শাসন প্রচলিত রয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয়না। এমন অবস্থায় এক কালের মানুষের গতি কোন দিকে ঘুরে যাচ্ছে ঠিক করে বলা মুস্কিল। সে জন্য সচেতন জ্ঞানী যারা তাহাদের উচিত সত্য ধর্মের দিকে গভীর বিশ্বাসে ঝুকে পড়া, সত্য জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং অজ্ঞানের ক্ষমতা, মিথ্যার ক্ষমতা পরিহার করে জ্ঞানের ক্ষমতা, সত্যের ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় বা পরের সুখ কেড়ে নেয়, তাহলে মরনের পর তার কোন সুখ সঞ্চিত থাকেনা। অর্থাৎ পরজন্মের সেজন দুঃখে পতিত হয়। যেহেতু অজ্ঞানের ক্ষমতা মিথ্যার ক্ষমতাই সে ব্যক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু যিনি জ্ঞানের ক্ষমতা, সত্যের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের পরের সকলের নিকট প্রসংশনীয় স্মরণীয়, বরণীয় এবং নিজেও হন ধন্য। মরণের পরে তারই একমাত্র সুখ লাভ হয়ে থাকে।

জ্ঞানীব্যক্তি নিজের জন্য বা পরের জন্য দেশবা রাষ্ট্র কামনা করেননা, পুত্র-কন্যা কামনা করেন না, ধন কামনা করেন না, এমনকি অন্যায়ভাবে আপন সমৃদ্ধি বা নিজের উন্নতিও ইচ্ছা করেন না, তারা জানেন জীবন নশ্বর, ধন সম্পত্তি ক্ষনণস্থায়ী। মূলতঃ ঐ সব দুঃখেরই একমাত্র কারণ। তাই তারা জাতির স্বার্থ কিংবা ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যায় পন্থা পরিহার পূর্বক সৎপথ ও ন্যায় নীতির অবলম্বন করেন। যেখানে জাতির উদ্ভব সেখানে স্বার্থপরতার আবির্ভাব ঘটে। স্বার্থের খাতিরে কৃতকর্ম অন্যায় বর্জিত নয়। প্রবঞ্চনা ব্যতীত কেউ স্বার্থের হাসিল করতে পারেনা। জাতিয়তাবাদের দ্বারা স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, রূপ, মহাবিষের সৃষ্টি করে পরস্পর পরস্পরকে হানাহানি মারামারি, অন্যায় অবিচার প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজ করার ফলে বহুজনের দুঃখ, বহুজনের অমঙ্গল অশান্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই জাতীয়তাবাদকে বুদ্ধ একেবারেই অযোগ্য বলেছেন।

এ সংসারে জন্মগ্রহন করলে যেমন নানা উপঘাতক কর্মের দ্বারা কিংবা রোগব্যাধির দ্বারা, অথবা পূণ্যক্ষয়ে, আয়ুক্ষয়ে একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, ঠিক তেমনি এজগতে উৎপন্ন যে কোন জাতির ও একদিন ধ্বংস অনিবার্য। যেমন ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির সুচিকিৎসা লাভ না হলে জীবন ধ্বংসের ন্যায় সৎ ও কুশলকর্ম সম্পাদন বিমূখ জাতিরও

অধঃপতন হয়। পূণ্যবান, সুস্থ শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তি সৎ ও যথোচিত কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ জীবিত থাকেন এবং জীবনে কোন প্রকার দুঃখ দুর্দশায় পতিত হন না। সেরূপ যে জাতির মধ্যে অকুশল পাপ কর্ম-রূপ মারাত্মক ব্যাধির কারণ সমূহকে বর্জন করে সর্বদা সৎ ও মঙ্গলজনক পূণ্য কর্ম সম্পাদিত হয়। সে জাতি দীর্ঘায়ু সম্পন্ন পূণ্যবান ব্যক্তির ন্যায় বহুদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। কিন্তু অন্যায় অনাচার অকুশল পাপ কর্মে যে দেশের মানুষ সম্পাদন করে উপঘাতক কর্ম তথা রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত মানব সদৃশ সে জাতির অধঃপতন, ধ্বংস অনিবার্য। অতিরিক্ত দুর্দান্ত অসংযত পাপী রাজা ও প্রজা যে দেশের অধিকারী হয়, দেবতাগণ ক্ষীপ্ত হয়ে রাজ্যবাসী সহ সে দেশ ধ্বংস সাধন করেন- এমন প্রমাণ শাস্ত্রে মিলে। কাজেই সচেতন জ্ঞানী যারা রাজ্য রক্ষা কিংবা জাতি রক্ষার তরে অন্যায় পথ অবলম্বন করা তাদের মোটেই সমীচীন নয়।

পরাভব সুত্রে দেখা যায় পূণ্যহীন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে রাজত্ব লাভ করে রাজা হবার বাসনা পরজয়েই পর্যবসিত করায়। সে জন্য বর্তমান দুঃখ গ্রস্ত পথহারা নর-নারীদের প্রতি দয়ালু পরম আর্য্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভান্তের কণ্ঠে নিত্য শোনা যায় তোমরা জাতি বিশ্বাস করোনা, তুমি আমি এ ব্যবহারিক শব্দ বিশ্বাস করোনা, স্ত্রী-পুরুষ বিশ্বাস করোনা। তোমরা বিশ্বাস করো চারিআর্য সত্য, বিশ্বাস করো কর্ম এবং কর্মফল। ইহকাল পরকাল পূণর্জন্ম বিশ্বাস করো। এসব বিশ্বাস করলে সত্য ধর্ম সম্পাদিত হয়। যার ফলে ইহকাল, পরকাল উভয়কালে পরম সুখ শান্তি লাভ হয়ে থাকে। সমস্ত দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়।"

এ কালের সর্বজন হিতৈষী গভীর শ্রদ্ধাও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধের প্রতি বিশ্বস্ত পরম শ্রদ্ধেয় ভন্তে আরো উপদেশ দেন, তোমার মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন না হয়ে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হও। যারা মিথ্যা দৃষ্টি পরায়ন তারা জগতের দুঃখ, জগতের অমঙ্গল বিপদ ডেকে আনে। মিথ্যা দৃষ্টি মানুষেরা শুধু নিজের মতামতই গ্রহন করে, অন্য কারো বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন সৎপরামর্শ তারা গ্রহণ করতে পারে না। সে জন্য তারা মিথ্যা পথে পরিচালিত হয়ে কুমার্গে পতিত হয়। ফলে অনন্ত দুঃখে উপনীত হয়। মরনের পর আমাদের কি দশা হবে এরূপ দিশাহীন চিন্তার উদয়ে তারা চোখে সরিষার ফুল দেখে। বর্তমান জীবনে তাদের কৃত কর্মের মাধ্যমে বহুজনের দুঃখ অমঙ্গল, বিপদ সংঘটিত হয়ে তারা সকলের নিন্দার পাত্র হয়ে থাকে। মরনের পর তারা ঘোরতর দুঃখ পূর্ণ নরকে উৎপন্ন হয়ে অনন্তকাল নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকে। অপর পক্ষে যারা সম্যাক দৃষ্টি সম্পন্ন পুদগল, তারা নিজের বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন সত্যজ্ঞানের দ্বারা কৃত যাবতীয় মঙ্গলজনক

সুখাবহ সৎকর্ম সম্পাদনের মধ্যমে দেশের মঙ্গল, দেশের সুখ, দেশের উন্নতি এবং বহুজনের হিতসুখ, বহুজনের মঙ্গল উন্নতি সমৃদ্ধিমূলক কার্যের দ্বারা সর্বজনের পূজ্য পদ সকলের প্রশংসনীয় হয়ে থাকেন।

সুতরাং এযুগের এহেন ক্রান্তিলগ্নে সৎ মহাপুরুষদের মূল্যবান সারগর্ভ সত্যবাণী সমূহকে অবহেলা না করে সচেতন সুক্ষদর্শী জ্ঞানীগণ আসুন পন্ডিত জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের নিদের্শিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক সুমার্গে বিচরণ পূর্বক প্রত্যেকের জীবন পরিচালনার দ্বারা এদুর্লভ মানব জন্মকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তুলি।

বুদ্ধ শাসনে জন্ম করিয়া গ্রহণ
দুঃখকে করিয়া ভয় মুক্তির কারণ।
বুদ্ধবাণী অনুসারি দৃঢ় বীর্য্য বলে
প্রতিজ্ঞা করেন যোগী কভুনাহি টলে।

অপ্রাপ্ত মার্গ পাইব নিশ্চয় নিশ্চয়
অলব্ধ জ্ঞানকে লাভ করিব নিশ্চয়।
অপ্রত্যক্ষ ফল হবে, প্রত্যক্ষ আমার
আছে মোর পুরুষের বীর্য চমৎকার।

এই বল এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া,
করিব নির্বান লাভ পিছুনা হাটিয়া।
বিশেষ রূপেতে জ্ঞান লভিবার তরে,
বিদর্শন জ্ঞান আছে ভব মুক্তি তরে।

বিদর্শন ধ্যান বলে ইন্দ্রিয় দমিত হলে
বৃদ্ধিপায় দিন দিন জ্ঞানের ভান্ডার।
শুক্ল পক্ষে চন্দ্র যথা জ্ঞান বারে তথা,
নামরূপ দেখে যোগী অনিত্য অসার।

যাবতীয় কুসংস্কার, অনাচার, অত্যাচার এবং অন্যায়, অধর্ম পাপ কার্যমাত্রেই মানব জাতির দুশ্চিকিৎসা মহাব্যাধি - ***বনভান্তে***

সকল প্রাণী সুখী ও জ্ঞানী হোক।।

আর্য্যমিত্র বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংগ্রহে ঃ শ্রীমৎ বোধিমিত্র ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

জগতে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাবে দেব মনুষ্যগণ, দুঃখ হতে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পায়। সম্যক সম্বুদ্ধ মুক্তি দাতা এবং দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শক। একমাত্র সম্যক সম্বুদ্ধই চর্তুরার্য সত্য ব্যাখ্যা করে দেব মনুষ্যদের পরম শান্তি নির্বানের পথ উন্মুক্ত করতে পারেন। তাই সাধারণ মানুষেরা বুদ্ধের আবির্ভাবে দুঃখ মুক্তির পথের দিকে ব্যগ্র চিত্তে চেয়ে থাকে। বর্তমান গৌতম বুদ্ধের সময় আমরা যারা ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে না পারি আমাদের আগামী আর্যমিত্য বুদ্ধের আর্বিভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ভগবান গৌতম বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরকে বলেছিলেন- সকল মানুষ আমার সহিত সাক্ষাতে নাও আসতে পারে, কিন্তু যদি তারা আমার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে দান, শীল ও ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে এই কুশল কর্মের প্রভাবে তারা আর্য্যমিত্র বুদ্ধের সময়ে পুনঃজন্ম লাভ করবে।

দান শীল ভাবনা পূণ্য অর্জন করার উপায়। এইসব কুশল কর্মের প্রভাবে মানুষ সুগতি লাভ করে উচ্চতর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। মানুষের বীর্য্য ও ধৈর্য দিয়ে চেষ্টা করলে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হতে পারবে। যারা কুশল কর্ম করে এবং যারা তৎপর তারা ভিক্ষু-ভিক্ষুনী, উপাসক-উপাসিকা যেই হউক, তারা নিশ্চয় আগামী বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করতে পারবেন।

শ্রদ্ধেয় বনভান্তেও বলেন, যারা বর্তমানে দানশীল, কুশল কর্ম করতেছেন, তারা ভবিষ্যৎতে আর্যমিত্র বুদ্ধকে নাগাল পাবেন। আর যারা বর্তমানে ভিক্ষু ভিক্ষুনী উপাসক উপাসিকারা পাপ কার্য্য করতেছেন তারা আর্য্যমিত্র বুদ্ধকে নাগাল পাবেন না। সে সময়ে তারা চারি অপায়ে অর্থাৎ নরক, তির্য্যক প্রেত ও অসুর কুলে পড়ে থাকবে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- মানুষের আয়ু যখন অকুশল কর্মের প্রভাবে ক্রমে ১০ বৎসরে এসে পৌছবে, আবার কুশল কর্মের প্রভাবে যখন আয়ু বাড়তে থাকবে, যখন মানুষের আয়ু ৮০ হাজার বৎসর হবে তখন জগতে আর্য্য মিত্র বুদ্ধ আর্বিভাব হবে। আর্য্য মিত্র বোধিসত্ত্ব বীর্য দ্বারা ষোল অসংখ্য কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পরিপূর্ণ করে বর্তমান

তুষিত স্বর্গে অবস্থান করতেছেন। তিনি তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে জম্বুদীপে কেতুমতী (বর্তমান বারনসী) নগরে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করবেন। তার পিতার নাম সুব্রহ্ম, মাতার নাম ব্রহ্মবতী। স্ত্রীর নাম চন্দ্রমুখী, পুত্রের নাম ব্রহ্মবর্ধন। আর্য্য মিত্র বুদ্ধের গৃহি নাম হবে অজিত, বোধিসত্ত্বের জন্মের সাথে সাথে চন্দ্র সূর্য্য আলোক উজ্জ্বলতা সুবর্ন তারকার ন্যায় তার শরীর হতে আলো বাহির হবে। এই আলো সর্বদা বিদ্যমান থাকবে এবং দিবারাত্রির মধ্যে তারতম্য প্রত্যক্ষ করতে অসম্ভব হবে। জন সাধারণ জল ও স্থল পদ্মের পাতা ও পাঁপড়ি দেখে এবং পক্ষীদের কলবর শুনে সুর্যাস্ত এবং সুর্যোদয় সম্বন্ধে অবগত হবে। জন সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কার্যে নিয়োজিত না হয়ে ও সুস্বাদু ভাত খেয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে।

বুদ্ধের মহিমায় এবং করুনায় জনসাধারণ ধর্মের প্রতি উৎসাহিত হয়ে সংসার হতে মুক্ত হয়ে সুন্দর কাপড়ে ও অলংকারে সুসজ্জিত হবে। তখন জম্বুদ্বীপে ৮৪ হাজার নগর থাকবে। নব্বই শতকোটি রাজ পুত্র থাকবে। কেতুমতী নগর কন্টক বিহীন স্বচ্ছ সবুজ তৃনাবৃত থাকবে। আবহাওয়া সব সময় অনুকুলে থাকবে। বৃষ্টিপাত সময়োপযোগী হবে এবং বাতাস অতি উষ্ণ ও শীতল হবে না। সমস্ত জম্বুদ্বীপ ফুলে ফুলে সজ্জিত থাকবে। গ্রামের জন সাধারণ সুখে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করবে, কুরু রাজ্যের ন্যায় জম্বুদ্বীপ সদা উল্লসিত থাকবে। কেতুমতী শহরের অভ্যন্তরে কল্পতরু সজ্জিত থাকবে।

এই কল্পতরু হতে স্বর্গীয় মনিরত্ন ঝুলতে থাকবে এবং ইচ্ছানুযায়ী ধন সম্পদ কল্পতরু হতে পাওয়া যাবে। এই কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে একজন চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হবে। এই শঙ্খরাজা সপ্ত রত্নের অধিকারী হবেন। যথা- চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও বিনায়ক রত্ন, রাজার শীল প্রভাবে রাজ্যে কল্পতরুর আবির্ভাব হবে। রাজ্যের জন সাধারণের শীল প্রভাবে বিনাচাষে স্বয়ং জাত তন্ডুল উৎপন্ন হবে। উহা বিশুদ্ধ সুগন্ধ ও তুষ বিহীন হবে। কেতুমতী বাসীদের যে যত তন্ডুল চাইবে সে তত পরিমাণ তন্ডুল পাবে। কেতুমতী বাসীগণ অত্যন্ত ধনী হবে। তারা মন-মানসিক ও শারীরিক দিকদিয়ে অত্যন্ত সুখী হবে। রাজা শঙ্খের ৮৪ হাজার নর্তকী থাকবে। তাঁর এক সহস্র পুত্র থাকবে। রাজার শ্রেষ্ঠ পুত্র তার প্রধান মন্ত্রী হবেন। রাজা বিনা অস্ত্রে বিনাযুদ্ধে ধর্মানুসারে সসাগরা জম্বুদ্বীপ জয় করবেন। এই চক্রবর্তী শঙ্খ রাজা আর্য্যমিত্র বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হবেন। তার প্রব্রজিত নাম হবে

অশোক। আর্য্যমিত্র বোধিসত্ত্ব আট হাজার বৎসর গৃহবাসে থাকার পর সংসার ত্যাগ করবেন। তিনি নাগেশ্বর বৃক্ষতলে পদ্মাসনে বসে সাতদিন কঠোর সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। তার আয়ু হবে ৮২ হাজার বৎসর তিনি উচ্চতায় ৮৮ হাত হবে। আর্য্যমিত্র বুদ্ধের সময়ে অনেক প্রাণী ভবযন্ত্রনা হতে মুক্ত হবেন এবং কেহ যদি মুক্ত হতে না পারেন, তাতে স্বর্গ গমনের পথ প্রশস্ত করতে পারবেন।

সকলের মঙ্গলের জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আর্য্য মিত্র বুদ্ধের জন্ম ও জীবন লেখাহল। এই লেখার পুণ্যফলে এবং শীল পালনের পুন্যের প্রভাবে ভবিষ্যৎতে আমি যেন অন্তিম জন্মে রাজপুত্র হয়ে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করে সংঘের মধ্যে ষড়াভিজ্ঞ অরহৎ হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারি।

প্রার্থনা ঃ ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ জন্মিলে তখন
সে উত্তম শাস্তাকে করিয়া দরশন,
তার মুখে ধর্মসুধা করি আমি পান,
পাই যেন শ্রেষ্ঠ শান্তি অমৃত নির্বাণ।

সকল প্রাণী সুখী হউক
সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হউক।

সাধু - সাধু - সাধু।।

কর্মের গতি

শ্রীমৎ বুদ্ধ শ্রী ভিক্ষু
সুবলং, জুরাছড়ি শাখা বন বিহার

প্রাণী মাত্রই কর্মাধীন। কর্মই একমাত্র সক্রিয়। কর্মই সুখ-দুঃখ, কর্মই সৃজনকর্তা, কর্মই নিয়ামক, কর্মই সত্ত্বদিগকে হীন শ্রেষ্ঠে বিভাগ করিয়া দেয়। সত্ত্বগণের সুগতি-দুর্গতির কর্তা সে নিজেই, নিজের কর্মই তার জীবনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। দুষ্কর্মের ফলে চিত্ত কলুষিত হয়, আর কলুষিত চিত্ত অনেক দুঃখ বহন করে আনে। আর সুকর্মের ফলে চিত্ত প্রসন্ন হয় ওদমিত হয়, দমিত চিত্ত অনেক সুখ বহন করে। তদ্ধেতু যাহা কিছু দুঃখ উৎপন্ন হয় দুষ্কর্মের ফলে, আর যাহা কিছু সুখ উৎপন্ন হয় কুশল কর্মের ফলে, তাই বুদ্ধ বলিয়াছিলেন ধর্মপদে সকল দুষ্কর্ম হইতে বিরত থাকা, কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং আপনচিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখা- ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। শুভ কর্মের ফল শুভ, আর অশুভ কর্মের ফল অশুভ। এই হইল কর্ম নিয়ম। যেইরূপ বীজ বপন করিবে, সেইরূপ ফল লাভ করিবে। ঠিক তদ্রুপ, দুষ্কর্ম সম্পাদন করিয়া কোন দিন সুফলের আশা করা যায় না, দুষ্কর্মের ফল দুঃখ প্রদান করিবেই করিবে। কাজেই শুদ্ধি বা অশুদ্ধি নিজের কর্মের মধ্যদিয়াই লোকে লাভ করে, একে-অপরকে বিশুদ্ধ করিতে পারেনা। অতএব, নিজের সম্যক প্রচেষ্টাতেই আত্মশুদ্ধি সম্ভব। তাই আপন আপন কর্মের ফল অনুসরণ করিয়া মানুষ বিভিন্ন গতি লাভ করিয়া থাকে। কেহ বা উচ্চ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা নিম্ন যোনিতে জন্মিয়া অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর কেহ পায় দিব্য সুখময় স্বর্গবাসের অধিকার। আর যিনি অবিদ্যা-তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি লাভ করেন নির্বাণ। এক সময় বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন- হে ভিক্ষুগণ অবিদ্যা আবরণে আবৃত ও তৃষ্ণা সংযোজনে সংযোজিত সত্ত্বদের আদি অন্ত বিরহিত সংসারে পরিভ্রমণের আদি-অন্ত ভাগ দেখা যায় না। এই সংসারে সংসরণকারী একজন পুদ্গলের এক কল্পের অস্থি-কঙ্কাল সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, বৈপুল্য পর্বতের সমান স্তুপ হইবে। ইহা মহর্ষি বুদ্ধ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। এইরূপে সত্ত্বগণ দীর্ঘকাল সংসারে সংসরন কালে তীব্র কটু, দুঃখ, বৎসন ভোগ ও জন্ম বৃদ্ধি করিতে থাকে। সত্ত্বগণ এইরূপে সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষোভে অসহায় কাষ্ঠখন্ডের মত ভাসিয়া চলিতেছে। কিন্তু এরই মধ্যে এক দৃঢ় আশ্রয় গঠন

করিতে পারে- বীর্য, সৎকর্ম, সংযম, প্রজ্ঞা ইত্যাদি দ্বারা। এই সবের সাহায্যে সে অবিচল প্রতিষ্ঠা সিদ্ধি লাভ হয়, কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে পারে না। ভগবান ইহাও ঘোষনা করিয়াছেন- ভিক্ষুগণ, বীর্যবান আর্য শ্রাবক পাপ ত্যাগ করেন, পুণ্য বৃদ্ধি করেন, দোষযুক্ত বিষয় ত্যাগ করেন, নির্দোষ বিষয় গঠন করেন, পবিত্রভাবে স্বীয় জীবনযাপন করেন। বীর্যপুণ্য কাজে উৎসাহ যোগায়, পাপ কর্মে উদাসীনতা। পুণ্য বা সৎকর্ম অন্তরকে নির্মল, বিশুদ্ধ আনন্দে ভরিয়া তুলে। এই আনন্দের কোন তুলনা নাই। সৎকাজ যত ছোটই হউক না কেন তাহা একটি অনির্বাণ দীপশিখার মত মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে একপ্রকার নির্মল সুখ অনুভব করা যায়, যাহা পাপ কর্মে লাভ হয় না, সৎকর্মের ফলই মানুষের প্রকৃত সম্বল, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের উৎস। সৎকাজের ফল যেমন আনে মঙ্গল, অসৎ কাজের পরিণাম তেমনি আনে অমঙ্গল। এইভাবে সদাসৎ কাজের দ্বারা মানুষ নিজেই নির্মাণ করিতেছে নিজের সুখ বা দুঃখময় ভবিষ্যৎ যাহার হাত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। পাপ কর্মের প্রেরণা আসে মানুষের অশুভ বুদ্ধি হইতে। পাপ কর্মের সময় শুভবুদ্ধির বিলোপ ঘটে। কাজেই সৎকাজের অনুষ্ঠানে অধৈর্য-অবহেলা নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ এইসব সৎকর্মের ফল অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত হইয়াও পরিণামে মানুষকে মহৎ কল্যাণ দান করে। আর যিনি সর্বজীবে অহিংসা, ক্ষমা, মৈত্রী, প্রীতি আর কায়মনোবাক্যে সংযমে যিনি নিত্য প্রতিষ্ঠ, তিনি দুঃখ শোকের অতীত, শাশ্বত আনন্দলোকের অধিকারী হন। তাই যেই সমস্ত পুণ্যধন মানবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহা প্রত্যেকের সম্পাদন করা কর্তব্য।

সকল প্রাণী সুখী হউক

দুঃখ হইতে মুক্ত হউক।

সাধু - সাধু - সাধু।।

বৌদ্ধ ধর্ম ও কর্মবাদ

শান্তিভূষণ চাক্‌মা

জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু, মানব জীবনের অবধারিত পরিণতি। মানব জীবনের এই দুঃখময়তা উপলব্ধি করে সন্যাস ধর্ম অবলম্বন করতঃ মহাসাধক সিদ্ধার্থ জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু হতে মুক্তির পথ সন্ধানে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বোধি তরু তলে লাভ করেন চতুরার্য্য সত্য জ্ঞান তথা সম্বোধি এবং বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। তিনি এই চার আর্য্য সত্যের ভিত্তিতে প্রবর্তন ও প্রচার করেন বৌদ্ধ ধর্ম, যার অনুসারী বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ নরনারী এই ধর্মে ঈশ্বর ভগবান সৃষ্টি কর্তার বিদ্যমানতা অস্বীকার করতঃ কেবল মাত্র মানবীয় সাধনালব্ধ জ্ঞান দিয়ে প্রবর্ত্তিত, তাই বিশ্ব মানব সমাজে এই ধর্ম মানব ধর্ম হিসেবে অভিহিত।

তথাগত বুদ্ধ একদিন শ্রাবস্তীর পূর্ব রামে মিগার মাতার প্রসাদে পঞ্চদশীর পূর্ণিমার রাতে ভিক্ষু সংঘের চতুরার্য্য সত্যের ব্যাখ্যা দান করতঃ "দ্বয়তানু দস্‌সনী সুত্র" দেশনা করে বলেন, যে সব আর্য্য মুক্তি, সম্বোধি প্রদায়ক উত্তম ধর্ম আছে সে সব ধর্ম শ্রবণ করবার উদ্দেশ্য কি? তিনি নিজেই জবাব দিয়ে বলেন দু'টি দর্শনের সঠিক জ্ঞান লাভ। তিনি আরো বলেন কোন দু'টি দর্শনেরঃ

১। ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়ের কারণ আর্য্যসত্য- ইহা এক দর্শন।

২। ইহা দুঃখ নিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধ গামীনী প্রতিপদা বা উপায়- ইহা দ্বিতীয় দর্শন।

তৎপর বুদ্ধ বলেন, যিনি অপ্রমত্ত, উৎসাহ পূর্ণ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এই দর্শন দু'টির সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। তিনি ইহ জীবনে একটি ফল লাভ করবেন তা হলো চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি সম্পন্ন হয়ে অর্হত্ব লাভে জন্ম জরার অধীন হতে চির বিমুক্তি। যিনি এই দু'টি দর্শনের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না তিনি অনন্তকাল জন্ম জরার অধীন হয়ে জন্ম চক্র ও ভব চক্রে বিঘূর্নিত হতে থাকবেন। অতএব, দ্বয়তান দস্‌সনা সূত্রের এই দেশনা থেকে ইহা পরিস্কার ভাবে প্রতিভাত হয় যে, জন্ম জরার অধীন হতে মুক্তি পেতে হলে এই দর্শন দু'টির সঠিক জ্ঞান লাভ একান্ত অপরিহার্য্য।

প্রথম দর্শনঃ ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়ের কারণ আর্য্য সত্য নিয়ে আলোচনা। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন ভবের সর্বজীব কর্ম নিবন্ধন এবং স্ব স্ব কর্মের দৃশ্যমান স্থূল প্রতীক। আর এই কর্ম বন্ধনের মুক্তিই জীবের চরম পরিণতি নির্বাণ,- যা বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার বিবেচনা করিয়া ধর্ম বিশারদগণ বৌদ্ধ ধর্মকে কর্মবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তথাগত বুদ্ধ তার প্রবর্ত্তিত ধর্মে কর্মকে সৃষ্টিকর্তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। ইহাছাড়া বুদ্ধ ইহাও বলেছেন যে, জীবগণ নিজ নিজ কর্মের কর্মবীজ এবং কর্মফলের উত্তরাধিকারী। কর্ম ছাড়া জীবের এক মুহূর্ত অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এবার জীবকে কেন কর্মবীজ ও কর্মফলের প্রতীক বলা হয়েছে তার আলোচনা। অভিধর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবের জীবন দু' অংশে বিভক্ত (১) প্রবর্তন কাল তথা ইহলৌকিক কর্মময় জীবন অর্থাৎ কর্মভব (২) প্রতিসন্ধিকাল তথা পুনঃজন্ম ও উৎপত্তিভব। এই কর্মভব ও উৎপত্তি ভবের মধ্যে কর্মই হলো সেতুবন্ধন। প্রবর্ত্তনকালে তথা ইহলৌকিক কর্মময় জীবনে মানুষ তার অজান্তে তথা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বশে পুর্নজন্মের পঞ্চ হেতু উৎপন্ন করে থাকে, পরলোক গমনের পর প্রতিসন্ধিকালে এই পঞ্চ হেতুই পঞ্চ ফল প্রসবের মাধ্যমে- নব জীব সত্ত্বার সৃষ্টি করে উৎপত্তি ভবে কর্মফলের প্রতীকরূপে নিয়া আসে। কর্মভবের পঞ্চ হেতুই জীব বা মানুষের পুনঃজন্মের মূল কর্মবীজ। অন্য কোন কারণ নাই। এবার মানুষ তার কর্মভাব কিভাবে পুনঃজন্মের পঞ্চ হেতু উৎপন্ন করে তার আলোচনাঃ

১) অবিদ্যা :- মানুষ জাগতিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কামাবস্তুতে তথা, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চ কাম গুণে মোহগ্রস্ত হয়। এই মোহকে বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা।

২) সংস্কার :- কর্মকে ধর্মীয় পরিভাষায় বলা হয় সংস্কার। কর্ম ত্রিবিধ যথা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম। মানুষ আহার সাপেক্ষ, ভৌতিক দেহকে সচল ও কর্মক্ষম করে রাখার জন্য আহার সংগ্রহের নিমিত্তে মানুষ উপরোক্ত ত্রিবিধ কর্ম করতে বাধ্য। এই ব্যাপারে কিছু আধ্যাত্মিক আলোচনার প্রয়োজন তা হলো এই, চিত্তের চেতনায় কর্ম সম্পাদিত হয়। মূলতঃ চিত্তই মানুষকে কর্ম করায়, বাক্য বলায় ও চিন্তা করায়। চিত্ত মূলতঃ দ্বিবিধ যথা- অকুশল চিত্ত ও কুশল চিত্ত। যে চিত্ত জীবন দুঃখের (জন্মের) হেতু, তৃষ্ণার জনক, পরিপোষিক ও পরিবর্ধক, পুনঃজন্ম দায়ক সে চিত্তই অকুশল চিত্ত। আর যেই চিত্ত উহাদের ক্ষয়কারক ও ধ্বংস সাধক তাই কুশল চিত্ত।

সর্ব অকুশলের মূল লোভ দ্বেষ মোহ আর সর্ব কুশলের মূল অলোভ, অদ্বেষ অমোহ। লোভ দ্বেষ মোহ যখন চিত্তকে কলুষিত করে তখন চিত্ত হয় অকুশল চিত্ত। ফলতঃ অকুশল চিত্তের অকুশল চেতনায় মানুষ কায়িক বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ কর্ম বা সংস্কার উৎপন্ন করে যা হলো পুনঃজন্মের মূল কর্মবীজ।

৩) তৃষ্ণা ঃ- চক্ষুর সঙ্গে রূপের, কর্ণের সঙ্গে শব্দের, নাসিকার সঙ্গে আঘ্রানের জিহ্বার সঙ্গে আস্বাদের, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শের এবং মনের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগে ষড়বিধ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

৪) উপাদান ঃ- উপাদান অর্থ দৃঢ়ভাবে ধারণ। তৃষ্ণা তৃষ্ণার বিষয়বস্তুকে সাপের ভেক অনুসন্ধানের ন্যায় অনুসন্ধান করে বেড়ায় এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। এ'গুলো হলো কামোপাদান, দৃষ্টি উপাদান, আত্মপোদান, শীলব্রত উপাদান।

৫) ভব ঃ- ইহা ভব তৃষ্ণা। মানুষ কামলোক, রূপলোক ও অরূপ লোকে ভব তৃষ্ণায় পুনজন্ম প্রাপ্ত হয়।

কর্মভবের এই পঞ্চ হেতু মৃতকালীন অপসৃয়মাণ আসন্ন চিত্তের সহিত চ্যুতি চিত্তের, চুতি-চিত্তের সহিত প্রতিসন্ধী চিত্তের, এবং প্রতিসন্ধি চিত্তের সহিত ভব নিকান্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মাধ্যমে প্রতিসন্ধিকালে পঞ্চ নিয়ম ও কার্যকারণ বিধি এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ দ্বাদশ প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে পঞ্চফল প্রসব করতঃ নব বিজ্ঞান তথা কর্মফলের প্রতীকরূপে জীবকে উৎপত্তিভবে নিয়ে আসে এবং এভাবে কর্ম হেতুর সহিত কর্ম বিপাকের অর্থাৎ অতীত জন্মের সঙ্গে বর্তমান জন্মে পুনঃসংজ্ঞ বা পুনঃজন্ম কৃত্য সংসাধিত হয়। এবার কিভাবে পঞ্চ হেতু পঞ্চফল প্রসব করে তার আলোচনা ঃ জীব মানুষের পুর্নজন্ম ত্রিবিধ বিধিনীতির মাধ্যমে সংসাধিত হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এই ত্রিবিধ বিধিনীতি বর্ণিত হলো-

১) পঞ্চ নিয়মঃ- বৌদ্ধ ধর্ম মতে জড় চেতন রাজ্য নিম্নের পঞ্চ নিয়ম আবাহমানকাল বিদ্যমান। এগুলো কোন কর্মকর্তা নাই ইহারা নিজেরাই নিয়ম।

২) কর্মনিয়মঃ- কর্ম ও ফল নিয়ম যেমন ভাল কাজে ভাল ফল, মন্দ কাজে মন্দ ফল।

৩) ঋতু নিয়মঃ- ঋতু নিয়ম অনুসারে বৃক্ষ পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ হয়।

৪) চিত্ত নিয়মঃ- মানসিক নিয়ম ইহা মানসিক শক্তি, তথা চিত্ত বৃত্তি।

৫) ধর্ম নিয়মঃ- স্বভাব ধর্ম।

৬) বীজ নিয়মঃ- বীজের অঙ্কুরোদগমই বীজ নিয়ম।

১) একটি উপমাঃ- বীজ হতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় কিন্তু এজন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ যেমন বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজন মাটি, জল, বায়ু ও তাপ ইত্যাদি যা ছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হয় না। মানুষের পুনঃজন্মের ক্ষেত্রে ও ইহা ব্যতিক্রম নহে। মানুষ যোনিজাত হয়ে জন্ম ধারন করে। তাই প্রয়োজন মাতৃ গর্ভাশয়, মা ঋতুমতী হওয়া, পিতামাতার মিলন, এবং প্রতিসন্ধি গ্রহণকারী সত্ত্বের উপস্থিতি। উল্লেখযোগ্য যে, বোধিসত্ত্ব তার শেষ জন্মে শ্বেতহস্তী রূপে শ্বেত পদ্মফুল নিয়ে উপস্থিত হয়ে মহামায়ার গর্ভে সপ্তবার প্রদক্ষিন করতঃ প্রবেশ করেছিলেন। ইহাই হল প্রতিসন্ধি চিত্ত।

২) কার্য্যকারণ বিধিঃ- এই কার্য্যকারণ বিধির সূত্রটি হচ্ছে এই, কর্মফল প্রসব করে ইহা কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি। ফল কারন প্রদর্শন করে বলে এই কর্মফলে দেব, মনুষ্য ও প্রেতজন্ম। ফল পূর্ব হতেই কর্মের মধ্যে অঙ্কুর রূপে বিদ্যমান থাকে। বুদ্ধ বলেছেন, জগতে সর্বত্র হেতু ফল প্রত্যয়তা দৃষ্ট হয়। কদাচ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। মানুষের পুনঃজন্ম ও এই বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয় বলে মানুষকে বলা হয় কর্মফলের প্রতীক। যিনি পটিসম্ভিদা তথা হেতু ফল জ্ঞান লাভ করতে পারেন তার কাছে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোধগম্য।

৩) প্রতীত্য সমুৎপাদ দ্বাদশ প্রত্যয়ঃ- তথাগত বুদ্ধ বলেছেন- ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়াজড়ের যাবতীয় ঘটনা, উহাদের উপকরণ, উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি এক সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসারে সম্পাদিত হচ্ছে। এই বিধান সমূহকে বলা হয় প্রত্যয়। প্রতীত্য অর্থ কারণে বা হেতুতে নির্ভর করে, সমুৎপাদ অর্থ উৎপন্ন হয়। মানুষের পুনঃজন্ম দ্বাদশ প্রত্যয়ে সম্পাদিত হয় বলে এই নীতিকে বলা হয় দ্বাদশ প্রত্যয়। এই দ্বাদশ প্রত্যয় গুলোর মধ্যে কর্মভবের পঞ্চহেতুর উপর নির্ভর করে পঞ্চ ফল উৎপন্ন হয় তৎসঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু এই দুই প্রত্যয় যোগাযোগে জীবের জন্মচক্র ও ভবচক্র আবর্তিত ও বিবর্তিত হয় তথা দুঃখ রাশির সৃষ্টি হয়। এবার প্রতীত্য সমুৎপাদের দ্বাদশ প্রত্যয়গুলো ধারা বাহিকভাবে বর্ণিত হল- অবিদ্যা সংস্কার বিজ্ঞান নামরূপ ষড়ায়তন স্পর্শ বেদনা তৃষ্ণা উপাদান ভব জন্ম জরামরন। জন্ম মৃত্যু আনে, মৃত্যু জন্ম আনে একই জীবন প্রবাহের দু'টি দিক, একদিকে সূর্য্যাস্ত- অন্যদিকে সূর্যোদয় ইহাই জন্ম চক্র ও ভব চক্র। অবিদ্যা দ্বাদশ প্রত্যয়ের সর্ব প্রথম। সৃষ্টির জগতে অবিদ্যার একছত্র আধিপত্য ও রাজত্ব। এই অবিদ্যাচ্ছন্ন সংসারাবর্তে কখন কিভাবে অবিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা

জ্ঞানগম্য নহে, তাই জীব জগতের সৃষ্টির পূর্ব সীমানা দেখা যায় না অর্থাৎ সৃষ্টি আদি অন্তবিহীন।

দ্বিতীয় দর্শনঃ- দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্যসত্য নিয়ে আলোচনা। এই দ্বিতীয় দর্শনটি বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্বের সকল ধর্ম হতে পৃথক করে স্বতন্ত্র এক মর্যাদার আসন দান করেছে এবং তথাগত বুদ্ধকে অভিহিত করেছে মুক্তির পথ প্রদর্শক যারফলে তিনি বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের বিচারে জগতে মহাজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।

বুদ্ধ বলেছেন- জীব জগতে কেউ কাউকে ত্রাণ দিতে পারেনা। মানুষ নিজেই নিজের ত্রাণ কর্তা। বৌদ্ধ ধর্ম প্রজ্ঞা পরিশাসিত ধর্ম, প্রজ্ঞা লাভ ছাড়া বিমুক্তি লাভের কোন উপায় নেই তাই কি উপায় অবলম্বনে প্রজ্ঞা লাভ করা যায় তৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের প্রয়োজন। নির্বাণ বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য, প্রজ্ঞা লাভে নির্বাণ লাভ হয়, অবিদ্যা তৃষ্ণার ক্ষয় ধ্বংস সাধন হয়, দুঃখ মুক্তি ঘটে তাই নির্বাণকে চরম লক্ষ্যস্থল হিসেবে চিহ্নিত করে- তথাগত বুদ্ধের প্রদর্শিত সুনির্দিষ্ট একটি পথে ইহার পদচারণা যার নাম আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তথা পথ বা উপায়। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক সমন্বিত করে এই পথ যাত্রা। এই অষ্টাঙ্গগুলো হচ্ছে- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সংকল্প, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা ও সম্যক সমাধি। এই আর্য্য অষ্টাঙ্গকে সংক্ষেপ করলে হয় শীল সমাধি প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা শীর্ষে। এই তিনটি স্তর অতিক্রম করতে পারলে প্রজ্ঞা লাভ করা যায়। এই তিনটি স্তর অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন ত্রিশাসন তথা ত্রিশিক্ষা। আমরা যারা পৃথক জন, এবং শ্রমণ, ভিক্ষু, স্থবির, মহাস্থবির যারা অর্হত্ব মার্গফল লাভ করেন নাই তারা সবাই শৈক্ষ্য তথা শিক্ষার্থী। এই ত্রিশিক্ষা হলো-

১) পরিয়ত্তি শাসনঃ- ত্রিপিটক অধ্যায়ন করতঃ জ্ঞানার্জন- ইহাকে বলা হয় গ্রন্থধুর।

২) পটিপত্তি শাসনঃ- শমথ ও বিদর্শন সাধনা- ইহাকে বিদর্শন ধূর বলে।

৩) প্রতিবেধ শাসনঃ- চারিমার্গ, চারিফল ও নির্বাণ- এই নবলোকোত্তর ধর্ম জ্ঞান লাভ করাকে প্রতিবেধ শাসন বলা হয়।

এবার একে একে শীল সমাধি ও প্রজ্ঞার আলোচনাঃ

শীল বিশুদ্ধিঃ- শীল কি? শীল অর্থ চরিত্র। লোভ দ্বেষ মোহে যখন মানব চিত্ত কলুষিত হয় তখন চিত্ত অকুশল চিত্তে পরিণত হয় এবং মানুষ অকুশল চিত্তের অকুশল চেতনায় দশ অকুশল কর্ম পথে চলতে থাকে যারফলে মানুষ হয়ে উঠে ইন্দ্রিয় পরায়ণ, মাদক আসক্ত, চোর ও অসৎ জীবি সংক্ষেপে পাপাচারী। শীল পবিত্র জীবনের ভিত্তি, চারি পরিশুদ্ধ শীল যথা প্রতিমোক্ষ সংবর শীল, ইন্দ্রিয় সংবর শীল, আজীব পরিশুদ্ধ শীল ও চতুর্প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল পালনে মানব চরিত্রের আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়- মানুষ হয়- সৎ চরিত্রের অধিকারী ও সদ্ধর্ম পরায়ণ। ইহা বিশুদ্ধ শীল পালনের মহৎ ফল মানবের প্রজ্ঞা ও নির্বাণ লাভের আদি কল্যান। এই শীলের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদর্শক দ্বিতীয় স্তর সমাধিতে উপনীত হন।

সমাধি তথা চিত্ত বিশুদ্ধিঃ- সমাধি অর্থ কি? একটি কর্মস্থল বা বিষয়বস্তুতে চিত্তকে নিবিষ্ট, নিশ্চল ও একাগ্র করাই হলো সমাধি। শমথ সাধনায় চঞ্চল, অসংযমী, দুর্দ্দমনীয় ও বহু ভ্রমণশীল চিত্ত পঞ্চ ধ্যান লাভের সাথে সাথে হয়ে উঠে শান্ত সমাহিত একাগ্র এবং ধ্যান জ্ঞান লাভের উপযোগী। ইহা শমথ সাধনার সুফল। ইহাকে চিত্ত বিশুদ্ধি বলা হয়। অতঃপর বিদর্শক প্রজ্ঞায় উপনীত হন। ইহা মধ্য কল্যাণ।

প্রজ্ঞাঃ- প্রজ্ঞা অর্থ অতি ব্যাপক। সংক্ষেপে সম্যক দৃষ্টিকে প্রজ্ঞা বলা হয়। ইহা দ্বিবিধ লৌকিক সম্যক দৃষ্টি ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। প্রজ্ঞা অর্থ অভ্রান্ত সত্য দর্শন। শান্ত সমাহিত ও একাগ্র চিত্তে বিদর্শন সাধনায় দশ বিদর্শন জ্ঞানের পরে অনুলোম জ্ঞান তথা সত্যানুদর্শন জ্ঞান লাভে বিদর্শকের কাছে চতুরার্য্য সত্য প্রকটিত হয় এবং বিদর্শককে এরূপ অবস্থায় বলা হয় শ্রোতাপন্ন তথা নির্বাণ স্রোতে পতিত পুরুষ। অতঃপর বিদর্শক সাধনা প্রভাবে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি লাভ করেন যাকে প্রজ্ঞা তথা লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি বলা হয়। এই প্রজ্ঞা বা লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টির অর্থ চারি মার্গ, চারিমার্গ ফল ও নির্বাণ। এই নবলোকোত্তর ধর্ম জ্ঞান লাভ। এই লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি অন্ধকে দৃষ্টি শক্তিদানের ন্যায়, মিথ্যা দৃষ্টিকে সত্য দর্শন করানোর ন্যায় মানবের অন্তরের অবিদ্যার অন্ধকার ও তৃষ্ণার মুলোৎচ্ছেদ করতঃ চারমার্গ, চারমার্গফল ও নির্বাণের পথকে প্রজ্ঞার আলোকে উদভাসিত করে বিদর্শককে নির্বাণ মার্গে উপনীত করে। নির্বাণ অনুত্তর, অচ্যুত অব্যয়, ইহার উপরে মানবের চাওয়া পাওয়ার আর কিছু থাকে না। দুঃখকে পরিহার করে চির সুখের থাকার কামনা-বাসনা মানুষের চিরন্তন বৌদ্ধ ধর্ম তারই পরিপূরক। নির্বাণ চির প্রশান্তির আধার যা পারমার্থিকভাবে চির বিদ্যমান এবং পারমার্থের নামান্তরই নির্বাণ। নবলোকোত্তর ধর্ম লাভে অর্হত্ব লাভ হয়। অর্হৎ গণ মুক্ত, শুদ্ধ পুরুষ। তাদের পুনঃজন্ম নাই, কারণ নির্বাণ লাভে পুনঃজন্মের

হেতু সমূহ উচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবার নির্বাণ কি? দার্শনিক অর্থে নির্বাণ অর্থ দুঃখ মুক্তি, মনতাত্ত্বিক অর্থে আত্মবাদের মুলোৎপাটন, শাস্ত্রানুসারে লোভ, দ্বেষ, মোহের পরিসমাপ্তি, ধর্ম সাধনা ও কর্ম সাধনা অনুসারে প্রজ্ঞা লাভে জন্ম জন্মান্তর দু' মূল অবিদ্যা ও তৃষ্ণার ক্ষয় ও ধ্বংস সাধনে চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি সম্পন্ন অর্হৎ হয়ে জন্ম জরার অধীন হতে চির বিমুক্তি।

বুদ্ধ বলেছেন পূর্ব কর্ম প্রভাবে মানুষের কর্মফলের প্রতীকরূপে বর্তমান জন্ম ও জীবন। ফলের উপর মানুষের কোন আধিপত্য নাই। কিন্তু এই ফলের বীজ হতে যে পুনঃ কর্মাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাতে মানবের পূর্ণ অধিকার আছে। বর্তমান কালই শ্রেষ্ঠ ও সুসময়, অন্তবিহীন জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর দুঃখ ময়তা উপলব্ধি করে কর্মকে একমাত্র বন্ধু, আপন ও আশ্রয় জ্ঞান করে সদ্ধর্মের প্রতি অচলা, শ্রদ্ধার দ্বারা তৃষ্ণার স্রোত, অপ্রমাদের দ্বারা লোভ দ্বেষ মোহের মূলোচ্ছেদ করাই একজন প্রকৃত বৌদ্ধের আসল করণীয়। যে জন্য তথাগত বুদ্ধ কর্মকে তার ধর্মে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরিশেষে আমরা তথা সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় মনে প্রাণে- বিশ্বাস করি, বিংশ শতাব্দীর জাতিগত নিপীড়ন, ধর্মীয় অনাচারে বিক্ষুব্ধ বর্তমান বিশ্বে পরম পূজনীয় মহাসাধক, মহাজ্ঞানী, মহামানব শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো, প্রকৃতই একজন মুক্ত, শুদ্ধ, অর্হৎ ও ক্ষীনজন্মা মহাপুরুষ। তাঁর আবির্ভাব, তাকে এক নজরে দেখা, ও তার মুখঃ নিসৃত ধর্মীয় বাণী শ্রবণ করা অতীব পূণ্য ও সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁর প্রদত্ত ধর্ম দেশনাই হোক আমাদের জীবনের চলার পথ ও পাথেয় এবং আজকের অঙ্গীকার।

বিশ্বের সকল প্রাণী নির্বাণ লাভ করুক।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

বোধিসত্ত্বের বোধিচর্য্যায় পারমীর প্রভাব

ত্রিপুরারি বিজয় চাক্‌মা

ভগবান বুদ্দের পরম বোধি লাভের পূর্ব্ববর্তী বিভিন্ন যোনীর জীবন সমূহ হচ্ছে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর অবস্থা। যে অবস্থায় বিভিন্ন যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে সম্বোধি প্রাপ্ত হন যা চাওয়া তা পাওয়া এ বুদ্ধত্বই আজ সমস্ত বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোক তাঁর পূজারী। বোধিসত্ত্ব অর্থে যিনি, দান, শীল সত্য শিষ্টাচার ও প্রজ্ঞায় বিশিষ্ট গুনে গুনজ্ঞ। চরমগুনের অধিকারী হয়ে পারমী পূণ করেন। পারমী অর্থ হচ্ছে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত বলিষ্ট কুশল কর্ম্ম শক্তি আয়ত্বের প্রগুনময় কর্ম্ম সম্পাদন সমূহ। যিনি পরমার্থ কর্ম্ম সম্পাদন করে থাকেন তিনিই বোধিসত্ত্ব। পরম শব্দের অর্থ হচ্ছে পঞ্চস্কন্দময় দেহ পরিশুদ্ধি লাভের মুখে প্রতিকুল অন্তরায় সমূহ সমূলে মূলোচ্ছেদ করে বিমুক্ত থাকা অর্থাৎ তপচর্য্যা। শাস্ত্রে চার প্রকার চর্য্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতি চর্য্যা বুদ্ধ হবো এ অভিলাষ, প্রনিধান চর্য্যা বুদ্ধ হবার দৃঢ় সংকল্প, অনুলোম চর্য্যা– বুদ্ধ হবো এ সংকল্পের অনুকুলে পারমীর অধিস্থান। আর অনিবর্ত্তন চর্য্যা যেভাবে হোক অধিস্থান হতে বিচ্যুত হবোনা। অভিধর্ম্ম মতে, চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বানকে পরমার্থ বলা হয়। গৌতমবুদ্ধ ভগবান দীপংকর বুদ্ধ হতে সুমেধ তাপসরূপে বুদ্ধত্ব প্রার্থনার পর এক লক্ষাধিক চার অসংখ্যেয় কল্প ধরে ৫৫০ বার বিভিন্ন যোনীতে জন্ম পরিগ্রহ করে বোধিসত্ত্ব জীবন অতিবাহিত করেন এবং প্রতি স্কন্ধে নেতৃস্থানীয় আসনে পারমী সম্ভার অর্থাৎ ত্রিশ প্রকার পারমী, উপ–পারমী ও পরমার্থ পারমী সহ পূর্ণ করে অন্তিম জন্মে রাজা বেসসন্তর রূপে জন্ম নিয়ে তুষিত দেবলোকে শ্বেত পুত্র দেব পুত্র রূপে এবং তথা হতে দুঃখার্ত্ত জীবজগতের দুঃখ মোচনের জন্য দেবব্রহ্মাগণের অনুরোধে মানব কুলে ক্ষত্রিয় বংশে কপিলা বস্তুর শুদ্ধোধন রাজ তনয় রূপে পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের ব্যক্ত অনুসারে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিগনিত হন। তাই বুদ্ধ জন্ম খুবই দুলর্ভ। বোধিসত্ত্ব অবস্তায় পরম বোধি লাভের নিমিত্ত আট প্রকার অভিনীহার প্রত্যয়ের অধিকারী হতে হয় এবং সাত প্রকার বোধি অঙ্গের মাধ্যমে চর্য্যা করতে হয় যথা স্মৃতি, ধর্ম বিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রসদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা। অভিনীহার হচ্ছে বুদ্ধ হবার সম্পত্তি বা গুনাদি। যথা– মনুষ্য জন্ম, পুরুষত্ব, হেতু শাস্তার দর্শন প্রব্যজ্যাসহ অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ, বুদ্ধত্ব প্রার্থনা, ছন্দময় গুন ও অধিকার। নিম্নোক্ত অর্থে বুদ্ধ কারক ধর্ম্মে বা পারমীতে অটল থেকে কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া। বুদ্ধত্ব লাভে বীর্য পরাক্রম অনুসারে তিনটি স্তর বিষয়ক

সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রথম স্তরে নিম্নভাগে শতসহস্র চার অসংখ্যেয় মহা কল্প, দ্বিতীয় স্তরে মধ্যভাগে শত সহস্র আট অসংখ্যেয় মহা কল্পতৃতীয় স্তরে উপরি ভাগে শত সহস্র ষোল অসংখ্যেয় মহাকল্প সেই জন্য জগতে বুদ্ধ উৎপত্তি কল্পনাতীত। অভিনীহার সম্পত্তি গুনে সমন্বিত সর্বপ্রথমে চর্য্যার প্রারম্ভে বোধিসত্বগণ বোধিচিত্ত উৎপাদন কল্পে প্রার্থনা করে থাকেন, আমি যেন আতুর অন্ধ রোগ শোকগ্রস্ত ও অপূর্ণাঙ্গদের চিকিৎসক হই। আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত তাদের ঔষধ, শয্যা রূপে ব্যবহৃত হই। সর্ব্ব জীবে, অন্নবস্ত্র পানীয় বিতরনে সক্ষম ও পরিচালক হই। তাদের কল্যাণে অভাবে অনটনে, রোগে, শোকে পাছে থাকি। ভ্রান্ত পথিকের পথ প্রদর্শক ও পারাপার করার কর্ণধার, সেতু, দীপাকাঙ্খীদের প্রদীপ, দীনদের সহায় হই, এভাবে চিত্ত উৎপাদন করতঃ সর্ব প্রথমে দান পারমীকে পূর্ন করি। দানেই আমার চিত্ত প্রতিষ্ঠিত অধোকৃত কুম্ভের মতো নিঃশেষে দান, পরমার্থে পারমীতে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যয়, স্ত্রী পুত্র কন্যা দান আমার চিত্তগড়া তবুও আমার দান তৃপ্ত হয়না। নিদানে উল্লেখ আছে "কভু যদি কেহ আসে আহারের কারন, নিজদেহ আহারে করিনু সমর্পন।" এখানেই ছন্দের মাহাত্মের বিকাশ লাভ। এরপর পূর্ণ করেন শীল পারমী আত্মবিবেক চিত্ত বলেন, সমগ্র জগত আবৃত্ত করার মতো চর্ম্ম আমার নেই স্বীয় পদ পুত্য করলেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড আবৃত করা সম্ভব। আমি নিজ চিত্তকেই দমন করেছি, শীল পারমী দিয়ে এ চিত্তই পঞ্চকাম গুণের চিত্ত নগরকে সুরক্ষিত করেছি। সেই চিত্ত দিয়ে সাম্প্রজন্য ও স্মৃতি শক্তি জোগায়েছি, সর্ব্বপ্রাণীর হিত সুখ এ শীল, আমি জন্মে জন্মে অপরিসীম দুঃখযন্ত্রনা ভোগ করেছি, এ শীল পারমী পূর্ন করতে। তৎপর আমি নিজকে অভিনিষ্ঠ করেছি ক্ষান্তি পারমীর প্রতি। ক্ষান্তি তুল্য শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। ক্রোধহীনতা বৈরীতা নাশের একমাত্র পারমী, দেবলোকে গমনের সেতু আর্য্যদের বল সম্পদ। ক্ষান্তি সম্পদের অভাবেই জীবজগত উভয়লোকে অনুশোচিত। তিনি বলতেছেন, জগত অনিত্য, তবে কার জন্য এত ক্রোধ, লোভ দ্বেষ? ক্ষান্তি হীনতাই বর্তমান জন্ম বীজ বপন করেছে, দুঃখ উৎপন্ন হয়েছে। সমস্ত প্রাণী আমার ওরসজাত পুত্র, তাই আমার ভক্তদের উপর, রাগ, দ্বেষ, করা অনুচিত দ্বেষের তুল্য পাপ নেই। ক্ষান্তি তুল্য তপস্যা নেই। তাই সত্বাগণ ক্ষমাশীল হও। সামান্য দুঃখ, ক্ষনিক যন্ত্রনা সহ্য করতে করতে মহা দুঃখাদি সহনশীল হয়। তাপ-শৈত্যে সহনশীল হও নতুবা শুধু সংসার চক্রে বেদনাদি বাড়বে। সামান্য ঘর্ষন মর্ষন সহ্য করতে না পেরে আমি দেহরূপ পঞ্চফোড়া অসহনীয় ভাবে মোহাঙ্গ হয়ে নিজেই বহুবার গ্রহণ করেছি। যদি বেদনা পাই কাকে দোষ দেবো? দুঃখ আমার অভিপ্রেত নয়। তবুও এ দুঃখের হেতু দেহকে নিজেই সৃজন করেছি। আমার ঔরস জাত পুত্রের অনিষ্ট চিন্তা ভয়ঙ্কর

বড়িশ সদৃশ যা বাড়িশি। তোমাকে ফেলার জন্য বড়িশ ফেলে রেখেছে। ক্রান্তি পারমী চর্য্যাকালে আমি বহু জন্মে চেতনাহীন জড় বস্তু সদৃশ মহাযন্ত্রনা সহ্য করেছি। মূর্ত্তি, মন্দির, চৈত্য ধ্বংস, আমার ধর্ম্ম বিরুদ্ধে বলা, নিন্দা, অপবাদ এর উপর আমার রাগ নেই। ক্ষান্তিহীন হয়ে তুমি আজ দুঃখ কষ্ঠ ভোগ করতেছ। অন্য কর্তৃক দন্ডিত ও উৎপীড়িত হচ্ছ কারণ তুমি তাদৃশ কর্ম্ম করে ফেলেছ। এতে কেহ ভাগী হতে পারবেনা। অন্য দিকে ক্ষমাশীল হয়ে রাজ চক্রবর্তী তুল্য হয়েছি, তা বুদ্ধত্ব লাভের আগে। জীবগন সকলেই সাধনা করে ইহলোকে সুখ যশও সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। পর পর আমি বীর্য্য পারমী চর্য্যার অভিলাষী হই। দৃঢ় কর্ম্ম শক্তির প্রভাবই বীর্য্য সাফল্যের যষ্ঠি। মহাজাতকে আমার ভাষা ছিল–

'তীর হতে বহুদূরে মহাসিন্ধুর জলে,
যবে সব যাত্রী গেছে মৃত্যুর কবলে।
তবুও অনন্য চিত্তে চলেছি একাই,
এক লক্ষ্য পথ মোর অন্য পথ নেই।"

এভাবে আমি মহা প্লাবন উত্তীর্ণ হয়েছি। এবার বিরাগ চিত্তে নৈষ্ক্রম্য পারমীতে অধিষ্ঠিত হলাম। এই সংসার রূপ বন্ধীশালা ত্যাগ করে আচরিত শ্রামন্য জীবন নিয়ে বিচরণ শুরু করি যাতে কোনরূপ ক্লেশ– মার আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বন্দী কারাগার বিষ্ঠা সদৃশ ঠেলে উন্মুক্ত জীবন লাভ করি। এ নৈষ্ক্রম্য পারমী পূরণ করতে বহু জন্মে, রাজ্য, ধন, দৌলত কতবার ত্যাগ করেছি। এরপর নিঃসঙ্গ জীবন ধরে প্রজ্ঞা পারমী চর্যাকালে আমার ধ্যান পটে ভাসতে লাগলো, বিদর্শন জ্ঞানে চিত্তাকাশে ঘুর পাক খেয়ে শুরু করলো জীবজগত অনিত্য, আজ চোখে যা দেখতেছি শত জন্মেও তার দেখা পাবোনা। চোখের সামনেই দেখতে দেখতে কতো প্রিয়জন অজানার যাত্রী, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা প্রিয়বস্তু ছেড়ে চলে গেল। প্রিয়জন, প্রিয়বস্তু না দেখলে অসন্তোষ জন্মে, দেখলে তৃষ্ণা, আসক্তি জন্মে, অথচ তাদের আচরণ সংস্পর্শ বারে বারে দুঃখ দেয়, মুহূর্তের বন্ধু শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আজ যাদের দেহাবয়ব, গঠনের প্রতি মোহিত, সুন্দর লাবন্যময়, দু'দিন পরে চর্ম্ম কুঞ্চিত, অস্থি চক্র, মাংস বিশুষ্ক, যেই নারীর যৌবনময় লোভনীর সে দেহতরী হবে ভগ্নপ্রবন, কদাকার, ঘৃনিত, তবে একই উপাদানে তৈরী অশুচি পদার্থে ভর্তি নারী কঙ্কালকে আলিঙ্গন করতে যাবো কেন? সৌন্দর্য্যময়ী দেহ রোগের করাল গ্রাসে জর্জ্জরিত, বিকৃত। মৃত্যু রাজা কাল যখন দ্বারে উপস্থিত সেই আদর, ভালবাসার স্থানে শোকাচ্ছন্ন, ধরাশারী হচ্ছে জড় দেহ। দীর্ঘপথ যাত্রী পথিক যেমন পান্থশালায় আশ্রয় নেই; তদ্রুপ সংসার রূপ জন্ম মৃত্যুর পথে বিচরন

করে, ব্যক্তি ও আত্মীয় স্বজনের আলয়ে-আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর প্রজ্ঞা পারমী শেষে সত্যের প্রতি, আদত, চিরসত্য পারমী অধিষ্ঠান করি। যা সত্য তা উপলব্ধি করেছি। সত্যের জন্য শীল, জীবনের বিনিময়ে সত্যকে রক্ষা করেছি।

বুদ্ধপদ লাভের জন্য জন্ম জন্মান্তরে, সত্যের সন্ধান করতে করতে মিথ্যা পথ বর্জন করে সত্যের সাধনায় সত্যের আচরনে জীবন সঁপে দিয়েছি। বহু জন্ম ধরে এভাবে সত্য পারমীর পূরন করেছি। সত্য পারমী পূর্ণতা লাভের পর আমি নানা যোনিতে ভ্রমন করে অধিস্থান পারমী পূরণে অভিনিবিষ্ঠ হই। সত্যকে পাওয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধ পদ লাভের নিমিত্তে দৃঢ় পরাক্রমে, দৃঢ় মনোবলে, দৃঢ় সংকল্পে বায়ু চালিত পর্ব্বত সদৃশ অটল থেকে কার্য্য সিদ্ধির জন্য অধিস্থান পারমীতে শেষ জীবনে গৌতম বুদ্ধকালে বোধিদ্রুম তলে অধিষ্ঠান করেছিলাম যে, "এখানে এই আসনে আমার ত্বক মাংস অস্থি শুষ্ক হয়ে যাক, তবুও পরম বোধিলাভ না করা পর্যন্ত এ ধ্যানাসন হতে উত্থিত হবোনা।" অধিস্থান পারমীর ভাষা এতাদৃশ সুগভীর পন্ডিত ভেদরহিত, ভাষাতীত, মনোজ্ঞ। এ পারমী পরে সাফল্যের সাথে শুরু করি ৯ম মৈত্রী পারমী। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব জাগরণ করে বহু জন্ম ধরে আমি মৈত্রী পারমী পূরণ করেছি। আত্ম সুখ ও আত্মহিতের নির্ভুল মার্গ জীবজগতের প্রতি মৈত্রীভাব পোষন করে, ক্রোধ, দ্বেষ-বৈরীতা বুদ্ধ কারক ধর্ম্মের মৈত্রী পারমী দ্বারা নিস্তেজ ও নিভৃত সমর্থ করেছি। দুর্ধর্ষ মারের যাবতীয় কারসাজি পন্ড, চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছি। যার ফলে স্বীয় এক লক্ষ্য পথে চলতে সমর্থ হয়েছি। আমার ইহা লৌকিক সম্পত্তি, আমার চিত্ত কল্যানে, অকল্যানে, উচ্চ-নীচে সমচিত্ত, সমুদ্র নদ-নদীর জল, পাপী তাপী পুন্য লোকের প্রতি সমভাব, সমদর্শী তা দৃশ সকল জীবের প্রতি মৈত্রী পরায়ন হয়ে নানা ক্লেশ ভোগ করে মৈত্রী পারমী পূরণ করেছি। পরিশেষে আমি উপেক্ষা পারমীতে মধ্যস্থ ভাবের প্রবর্তন করতে শুরু করি। সুখে দুঃখে মধ্যস্থ হয়ে বিচরন করেছি। পৃথিবী ও মহা সমুদ্রের কাছে শুচি অশুচি, ভেদাভেদ না রেখে সমদর্শী হয়ে আশ্রয় প্রদান করে তদ্রুপ সর্ব্বস্তরে সর্ব বিষয়ে উপেক্ষা ভাব অবলম্বন করে অবস্থান করেছি। এতেই আমার অভীষ্ঠ সিদ্ধ লাভ, অভিলাষিত লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছি। দশপ্রকার পারমী, উপ পারমী ও পরমার্থ পারমী পূরণের জন্য বুদ্ধপদ লাভ লগ্নে মাররাজ সসৈন্যে পরাজয় বরণ করে ছুটে পালিয়েছে। তা জন্ম জন্মান্তরে পারমী সভাব প্রগুণে, শীলগুন, পারমীগুনে। আমার দেহ প্রতিষ্ঠিত পারমী গুন অর্জনে আমাকে জন্মে জন্মে কঠোর সাধনা কষ্টায়স-কর্ম্ম সম্পাদনে আমার মাথা পিটের উপর বহে গেছে, ছুয়ে গেছে ঝড় ঝঞ্জা, নানা আভরণ।

রাঙ্গামাটিতে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা- দায়ক দায়িকাদের সাম্প্রতিক চিন্তা ভাবনা

সঞ্জয় বিকাশ চাক্‌মা

বৌদ্ধ ধর্ম একটি চিরন্তন সত্য ধর্ম। যে ধর্ম জ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ'খানে সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তৃষ্ণার নিগূঢ় উচ্ছ্বাসে কর্মের বিপাকে উৎপত্তি এবং বিলয়ের বিশ্বাসের বলে বলিয়ান। তাই এ' ধর্ম জাতি, বর্ণ বা গোত্রের ভেদাভেদের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উন্মুক্ত এবং উদার নীতিতে বিশ্বাসী। তবে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাবে এ' ধর্ম অধিগম করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই অনেকেই এ' ধর্মকে গ্রহণ করতে গিয়ে পিষ্ট, ক্লিষ্ট, দলিত, মথিত হয়ে শূন্যতায় হামাগুড়ি খাচ্ছে।

বিষয়ের প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটিতে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলে কিছুটা বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে যৎ সামান্য যা বুঝার বুঝেছি তাতে মনে হয় বৃহত্তর প্রার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র রাঙ্গামাটি শহরের বুকে বৌদ্ধদের (যারা বৌদ্ধ বলে দাবী করে) কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) এক শ্রেণীর লোক- যারা নিজেকে বৌদ্ধ বলে দাবী করে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নীতি আদর্শে বিশ্বাসী নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ এবং আচরণে বলিয়ান। অর্থাৎ "খাও দাও ফুর্ত্তি করো, সকল দুঃখ, চিন্তা হরো'' এমনতর অবস্থা।

(২) এক শ্রেণীর লোক- যারা নিজকে অতি ধার্মীক বলে পরিচয় দেয় অথচ বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ধর্মের দোহাই দিয়ে অধর্মের ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করার অপপ্রয়াসে সদাই লিপ্ত। সংখ্যার দিক থেকে সমাজে এদের আবস্থান তেমন কম নয়। এরাই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য মূলতঃ দায়ী।

(৩) এক শ্রেণীর লোক- যারা লৌকিক দৃষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ। লৌকিক জগতের উর্ধ্বে যে একটি লোকত্তর জগত আছে এতে তারা বিশ্বাসী হলেও নীতিগতভাবে এর পরিধির সীমানা পর্যন্ত বিচরণে উৎসাহী নয়। শীলাচরণের চাইতে দান ক্রিয়া সম্পাদন করার মধ্যেই মূলতঃ এরা অভ্যস্ত বেশী। অর্থাৎ এদের একান্ত বিশ্বাস দানের প্রভাবে ইহ জীবনে পরিবারের সকল সদস্যের রোগহীন, সুখ ও সমৃদ্ধি ঘটবে। পূর্ব জন্মের সু বা কু ক্রিয়া কর্মের প্রভাব যে তাকে ইহ জন্মে নিজ ছায়ার ন্যায়

প্রভাবিত করতে পারে এতে তারা মোটেও বিশ্বাসী নয়। তাই স্বীয় উদ্দেশ্যজনিত দান ক্রিয়ার বিপরীতে পরিবারে কোন কিছু হয়ে গেলে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ক্ষুন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজে এরা সংখ্যাধিক্য।

(৪) এমন এক শ্রেণীর লোক– যারা ধর্ম কর্মে উৎসাহী নয়। তবে সদাচরণে নিজের সংকীর্ণ প্রচেষ্টা অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর। এদের দ্বারা সমাজ কলংকিত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীন। পারতপক্ষে এদের দ্বারা সমাজ প্রাঞ্জল হয়, সমৃদ্ধ হয়। সমাজে এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

(৫) সমাজে এমন লোকের সংখ্যা খুবই বিরল। শতকরা একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। যারা সত্যিকার অর্থে বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসে বলিয়ান। তবে এর তেমন গভীরতা নেই। খুবই সীমিত এবং মৃদু। দান, শীল, ভাবনায় এদের জ্ঞানত প্রচেষ্ঠাতে ত্রুটি নেই। মাঝে মধ্যে যে বিতর্কের উদ্ভব হয় না তা' নয়। তবে তার সঠিক সমাধান কল্পে আর্যপুরুষ, কল্যাণমিত্র শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শনলাভ এবং হিতোপদেশ গ্রহণে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন না। নিজ দুঃখ মুক্তির প্রয়াসে এরা সদাই সচেষ্ট। এদের দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত বা সমৃদ্ধ হওয়ার ইংগিত পাওয়া দুষ্কর।

বৌদ্ধ ধর্ম ধারণ, গ্রহণ এর স্থিতি, বিস্তৃতির ক্ষেত্রে দায়ক-দায়িকাদের সাম্প্রতিক চিন্তা ভাবনার মূল্যায়ন করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে এ মনে হয়, সকলের জানা আছে মহামতি ভগবান বুদ্ধ আজ থেকে ২৫৪০ বৎসর পূর্বে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তার প্রচলিত ধর্মের সর্বমোট পাঁচ হাজার বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হতে ধর্মের ক্রমাগত পরিহানি শুরু করবে। তাঁর এ' মহান বাণী বাস্তব প্রতিফলন ঘট্‌তে শুরু করেছে তা' সকলেরই গোচরিভূত।

বৌদ্ধ ধর্মের ধারক, বাহক, পথ প্রদর্শক বুদ্ধপুত্র শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু শ্রামনদের বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও তার বিপরীতে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ। দুঃখী মানুষদের দুঃখমুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও তাঁর শিষ্যমন্ডলী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে পার্বত্য ভিক্ষুসংঘের শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু মন্ডলী সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের অগ্রদূত বলে দাবী করে যাচ্ছেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ কি চায়। দ্বিবিধ স্রোতধারায় বিক্ষিপ্ত পর্যুদস্থ সমাজ দিশেহারা হয়ে গন্তব্যস্থল খুঁজে পাবার উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছে। তবে শ্রদ্ধেয়

বনভন্তের নীতি আদর্শের প্রতি সবাই যে শ্রদ্ধাশীল তা' একবাক্যে সবাই স্বীকার করবেন। তবে একথাও ঠিক যে, পার্বত্য ভিক্ষুসংঘের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরোর পরিচালিত প্রকল্পের প্রতি অনেকেই আস্থাশীল। তিনি অনেক দুঃখী, নিঃস্ব পরিবারের সন্তান সন্ততির শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজকে সমৃদ্ধশালী করার দৃঢ় প্রত্যয়েরত আছেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, একনিষ্ঠ দায়ক-দায়িকাদের মধ্যেও শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরোর কর্ম্ম প্রবাহের প্রতি সমর্থন বা সদিচ্ছা পোষণ করেন না তা নয়। তবে তা' পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সম্মুখে প্রকাশ করার সাহস হারিয়ে ফেলেন। আমরা যারা সাধারণ গৃহী (দায়ক-দায়িকা বলে দাবী করি) আমাদের দৃষ্টি মূলতঃ শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু শ্রামণদের প্রতি। তাদের নীতি আদর্শ, আচরণ এবং ক্রিয়া কলাপের উপরই আমাদের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার ভিত্তি নিহিত। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সমাজের মাঝে অপ্রিয় হলেও তিক্ত রেখাপাত করেছে। নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান সত্যের প্রভাবে এর উত্তোরণ ঘটাবার দৃঢ় মানসিকতা আমাদের অনেকেরই মাঝে নেই। আমরা সবাই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে অভ্যস্ত। ধর্মীয় সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পরিশেষে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে একটি প্রস্তাব রেখে যেতে চাই তা' হলো বনবিহারে, সম্ভব হলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহে পর্যায়ক্রমিক গ্রুপভিত্তিক ভাবনার কোর্স চালু করা। কারণ ভাবনা ব্যতিত মানসিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। মানসিক উৎকর্ষতা সাধিত না হলে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার নিরসন তথা জীবনের গতি নির্ধারণের পথ যে রুদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই।

'সকল প্রাণী সুখী হোক,
দুঃখ হতে মুক্ত হোক।।'

দানের মাহাত্ম্য

প্রকৌশলী নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

দানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু লিখার আগে প্রথমতঃ আমাদের জানিতে হইবে দান কি? কেন এবং কাকে দান দেওয়া হয়; দানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এই দানের সুফল কুফল আছে কি ইত্যাদি। কোন কিছু দেওয়াকে দান বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কোন কিছু দেওয়াকেই দান বুঝায়। স্বত্ব ত্যাগ বলিতে কোন বস্তু বা কোন দ্রব্যাদি অকাতরে চিরতরে প্রদান করাকেই দান বলে। আমাদের জাগতিক যে কোন কর্ম্মের দুইটি উদ্দেশ্য বিদ্যমান। যেমন, দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি। যে কোন কাজ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, ওই কার্য্যে তাঁহার কি পরিমান দুঃখ-হ্রাস হইল এবং কি পরিমাণ সুখ বৃদ্ধি হইল।

যদি দেখা যায় যে সে কাজটা দ্বারা দুঃখ বা সুখ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, তবে সেই কাজটা পাপ বা অকুশল, তাহা পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।

আমাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় দৃষ্টিতে দান, শীল ও ভাবনা এই তিন প্রকার কর্মই সুখ লাভের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। বৌদ্ধ ধর্মীয় দৃষ্টিতে যে দান দেওয়া হয় বা ত্যাগ করা হয়; তাহা দাতার চিত্তের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া দানের ফলাফল, দানের গুনাগুণ ও দানের শুভাশুভ ফলের কারণ ঘটায়। এই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মে দানের সময় দানদাতার চিত্তের প্রসন্নতা ও বিশুদ্ধির উপর দানের ফল একান্ত নির্ভরশীল। অর্থাৎ দানের সময় যেই দানে দাতার বস্তু সম্পত্তি, চিত্ত প্রসন্নতা, বা চিত্ত সম্পত্তি ও প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি পরিপূর্ণতা থাকিবে, সেই দানই সুখদায়ক বা মহাফলপ্রদ বলিয়া কথিত হয়। দান দেওয়ার জন্য দান করিবার পূর্বে, দান দেওয়ার সময় এবং দান দেওয়া হইলে মন বা চিত্তের যেই চিন্তা বা চেতনা জাগ্রত; সেই চিত্তাবস্থায় দানদাতার চিত্তে লোভ, দ্বেষ ও মোহশূন্য হইয়া যে দান-প্রীতি, দানানন্দ উৎপন্ন হয় তাহার নাম 'চিত্ত সম্পত্তি'। চিত্তের হীন উত্তম চেতনাই কুশলা কুশল কর্ম্ম। সুতরাং বিশুদ্ধ, শান্ত, উদার, কুশল প্রফুল্ল ও একাগ্র শ্রদ্ধাচিত্তেই দানকার্য্য সম্পাদন করা দান দাতার একান্তই কর্তব্য।

দান শব্দের অর্থ দানীয়বস্তু বা দেওয়ার চেতনা (ইচ্ছা)। দেওয়া শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করা, বিসর্জন করা, স্বত্ব ত্যাগ করিয়া নিজের দ্রব্য (দানীয় বস্তু) অপরকে দেওয়া। "অন্ন পানীয়" বস্ত্রাদি দান দেয়। এই অর্থই হইল দান।

"দানীয়বস্তু" দান দাতার লব্ধ শ্রম দ্বারা সদুপায়ে এবং অন্য কাউকে মনঃকষ্ট, আত্মপীড়ন না করিয়া ধর্মতঃ দাতা সেই দানীয়বস্তু, ধনসম্পদ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন তাহাই দানীয়বস্তু বা "বস্তু সম্পত্তি"। অসদুপায়ে সংগৃহীত বস্তু, টাকা-পয়সা, ধন সম্পদ এবং পরকে পীড়া প্রদানে সংগৃহীত দানীয়বস্তু দ্বারা যেই দান দেওয়া হয়; তাহা কুশলা কুশল চিত্তের চেতনানুযায়ী পাপ পূণ্য উভয় ফলই উৎপন্ন হয় বা ফল প্রদান করে বলিয়া কথিত হয়। সেই প্রকার দানকেই সাধারণতঃ "হীনদান" বলা হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মে দান বা দানীয়বস্তুর কোন সীমাবদ্ধতা নাই। তবে অন্ন, বস্ত্র, জল, যান, মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, শর্য্যা, গৃহ ও দীপ এই দশ প্রকার দানীয় বস্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রথম ও প্রধান দানীয় বস্তু হিসাবে স্থান লাভ করিয়া এই দশ প্রকার বস্তুদানের দাতাগণের সুখের হেতু বলিয়া কথিত। ভগবান তথাগত "বুদ্ধত্ব" লাভের জন্য দশপারমীর মাঝে প্রথম "দান পারমীকেই" গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

আগে বলা হইয়াছে দান কেন এবং কাহাকে দান দেওয়া হয়। দান গ্রহণে প্রকৃত পূজ্য বা দানের পাত্র কে? অর্থাৎ যে দানের দ্বারা দাতার "মহাফল প্রদ" হয় এবং নির্বাণ লাভের জন্য সহায় হয়। বৌদ্ধ ধর্মে মোট চৌদ্দ প্রকার পুদগল বা ব্যক্তিকে দান দিবার বা দক্ষিনার উপযুক্ত পাত্র বা ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে। যেমন- (১) তথাগত অর্থাৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, (২) প্রত্যেক বুদ্ধ বা পচ্চেক বুদ্ধ, (৩) তথাগত শ্রাবক (বুদ্ধের শিষ্য) অর্হৎ (৪) অর্হত্বফল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত, (৫) অনাগামী, (৬) অনাগামী ফল প্রাপ্তিরজন্য চেষ্টিত, (৭) সকৃদাগামী, (৮) সকৃদাগামী ফল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত, (৯) স্রোতাপন্ন, (১০) স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত, (১১) বাহিরের কাম সকল পরিত্যাগকারী, (১২) শীলবান পৃথগজন, (১৩) দুঃশীল পৃথগজন, (১৪) তির্য্যক যোনি প্রাপ্ত পশু-পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি। এই চৌদ্দ প্রকার পুদগল ব্যক্তি দানের পাত্রের মধ্যে তথাগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় তীর্থস্থান রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে অবস্থানরত এই মহাপবিত্র রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় লোকোত্তর আর্যপুরুষ "অর্হৎ" শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে মহোদয় শিষ্যমন্ডলীসহ অবস্থান করিতেছেন। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থী এই পবিত্র তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন এবং বুদ্ধপুত্রের নিকট প্রতিনিয়ত লোকিক ও লোকোত্তর ধর্মীয় দেশনা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। প্রতিনিয়ত শত শত পুণ্যার্থী মহান আর্য্য পুরুষের নিকট হইতে মহান ধর্মীয় বাণী শ্রবণ ও দানযজ্ঞ স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া

নিজের জীবন ধন্য ও মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন। উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় আর্য্যপুরুষ বনভন্তে প্রতিদিন দেশনাকালে আগত দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদিগকে বুদ্ধের অনুশাসন ও দানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তথাগত বুদ্ধের উপদেশ বাণী উল্লেখ করিয়া দান ও দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং বলেন– ভগবান তথাগত বুদ্ধ দাতাগণকে দানের শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন– "দাতা বা দায়ক ভোজনদান করিয়া প্রতিগ্রাহককে পাঁচটি বিষয় দান করে, সেই পাঁচটি বিষয় কি? ভোজনদানে আয়ুদান করে, বর্ণদান করে, সুখ দান করে, শক্তি দান করে, এবং প্রজ্ঞাদান করে। ভোজ্যবস্তু দানকারী সে দায়ক আয়ু দান করিয়া দিব্য ও মানুষ্যিক আয়ুর ভাগী হয়, বর্ণদান করিয়া দিব্য ও মানুষ্যিক বর্ণের ভাগী হয়, বলদান করিয়া মানুষ্যিক শক্তির ভাগী হয় এবং প্রজ্ঞা দান করিয়া দিব্য ও মানুষ্যিক প্রজ্ঞার ভাগী হয়। তিনি ভগবান তথাগতের দেশনার পুনরাবৃত্তি করেন এভাবে– "আয়ু, বর্ণ, সুখ বল ও প্রজ্ঞা দানকারী ধীর মেধাবী যে কোন স্থানে উৎপন্ন হউক না কেন তথায় সে দীর্ঘায়ু ও যশস্বী হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ, দান দেওয়ার ফল আমি যেইরূপ জানি সত্বগণ যদি সেইরূপ জানিত, তবে তাহারা দান না করিয়া ভোজন করিত না। যাহারা দানের বিপাক জানে তাহারা যাচক উপস্থিত হইলে নিজের জন্য রক্ষিত এক অন্তিম গ্রাস (নিজের জন্য রক্ষিত অবস্থিত এক গ্রাস মাত্র ভোজ্যবস্তু) মাত্র ভোজ্য বস্তু হইতে ও ভাগ করিয়া দান দিত। সত্বগণ ভোজনদানের ফল আমার ন্যায় জানেনা; তদ্ধেতু তাহারা দান না দিয়া ভোজন করে।

দান দিয়া, শীল গ্রহণ ও পালন করিয়া কেহ কেহ গৃহপতি মহাসার কুলে উৎপন্ন হয়, কেহ কেহ মহাসার ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হয়, কেহ কেহ ক্ষত্রিয় মহাসার কুলে উৎপন্ন হয়, কেহ কেহ চর্তুমহারাজিক দেবলোকে, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে, কেহ কেহ নির্মাণরতি দেবলোকে, আর কেহ কেহ পরিনির্বাণ বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হয়।

দান ও দানের ফল বিশ্বাস করিয়া দান দেওয়া, দানীয় বস্তু ও দান গ্রহীতার প্রতি সম্মান করিয়া দান দেওয়া, উপযুক্ত সময়ে দান দেওয়া, চিত্তে কার্পন্যভাব না রাখিয়া দান দেওয়া এবং আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা না করিয়া দান দেওয়া এই পাঁচটিকে সৎপুরুষ দান বলে।

দানীয় বস্তু হীন হউক বা শ্রেষ্ঠ হউক, তাহা সৎকার পূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে স্বহস্তে, গৌরবের সহিত "এই দান কর্মের ফল পাইব" বিশ্বাস করিয়া দান দেওয়া হইলে তৎফলে দায়ক জন্ম জন্মান্তরে প্রচুর পরিমাণে পঞ্চকাম সুখ পরিভোগ ও পরিতৃপ্ত হয়;

অর্থাৎ আয়ু, বর্ণ, সুখ যশঃ সর্বভোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং পরে স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইয়া প্রমোদিত হয়। যে শীলবান ব্যক্তি ধম্মতঃ লব্ধবস্তু কর্ম্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়া প্রসন্নচিত্তে দান দেয়, সেই দানই বিপুল ফলদায়ক হয়।"

অধিকন্তু ভগবান বুদ্ধ "ধম্মদানং সব্বদানং জীনাতি" অর্থাৎ সর্বদানের চেয়ে ধর্ম্ম দানকেই শ্রেষ্ঠতর দান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দান ও দানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দশপারমীর মধ্যে দান পারমীকে প্রথম ও প্রধান হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাকারুনিক ভগবান বুদ্ধ পবেয়্যকবাসী ৩০ জন ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া দানশ্রেষ্ঠ "কঠিন চীবর" দানের বিধান প্রবর্ত্তন করেন। ভগবান বুদ্ধ এক সময় পঞ্চশত ষড়াভিজ্ঞালাভী অরহত ভিক্ষুসহ আকাশমার্গে হিমালয়ের "অনোবতপ্ত হ্রদ" নামক মহাসরোবরে অনুত্তর ধর্মরাজ তথাগত বুদ্ধ সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্মাসনে উপবিস্থ হইয়া ছিলেন এবং অরহত সংঘকে সম্বোধন- করিয়া শতপুণ্য লক্ষণ তথাগত বুদ্ধ বলিলেন- "হে ভিক্ষুগণ তোমরা এইখানেই উপস্থিত হইয়া কঠিন চীবর দানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর" এবং সেই শুভ মুহূর্তে বুদ্ধ নাগিত স্থবিরকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করিতে বলিলেন- নাগিত স্থবির বলিলেন- (১) আজ হইতে ত্রিশ কল্প পূর্বে (সিখী বুদ্ধের সময়) গুনোত্তম সংঘকে কঠিন চীবর দান করিয়া এযাবৎ কোন নরক যন্ত্রণা ভোগ করি নাই। (২) আমি আঠার কল্প দেবলোকে দিব্যসুখ উপভোগ করিয়াছি। চৌত্রিশবার দেবরাজ ইন্দ্র হইয়া দেবলোক শাসন করিয়াছি। (৩) আমি মধ্যে মধ্যে রাজচক্রবর্তী সুখ লাভ করিয়াছি, যেখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেখানেই সর্ব সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। কোথাও আমার ভোগ সম্পদের অভাব হয় নাই। কঠিন চীবর দানের এটাই ফল। (৪) আমি সহস্রবার ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা হইয়াছি। কোন সময় মনুষ্যকোলে জন্ম করিলেও মহাপ্রভাবশালী ধনী গৃহে জন্মলাভ করিয়াছি।

নাগিত স্থবিরের পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে বলিলেন- "হে ভিক্ষু সংঘ, তোমরা শ্রবণ কর, আমার এক অতীত জন্মের কথা। শিখী সম্যকসম্বুদ্ধ যখন জগতে উৎপন্ন হন, তখন আমি "সঞ্জয়" নামক ব্রাহ্মন হইয়া কঠিন চীবর দান করিয়াছিলাম। তাহারা মহাফল সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্তি পর্যন্ত ভোগ করিতেছি।" ভগবান বলিলেন- (১) অন্যান্য দানীয় বস্তু একশত বছর দান করিলেও সেই পুণ্যাংশ কঠিন চীবর দানজনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশের ও সমান হয় না। (২) অষ্ট পরিষ্কার শত বছর দান করিলেও সেই পুণ্যাংশ কঠিন চীবর দান জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশের সমান

হয় না। (৩) সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধের মহাশ্রাবক সকল, কঠিন চীবর দানের ফল লাভে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৪) যিনি শ্রদ্ধাচিত্তে কঠিন চীবর সেলাই করেন, তিনি সেই পুণ্যের ফলে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত কনক বিমান, সহস্র অপসরা ও মনিমুক্তা বিদুর্য এবং কল্পবৃক্ষাদি সম্পন্ন দিব্য পুষ্করিনী লাভ করেন। কঠিন চীবর দানের বহু প্রকার গুন থাকার জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার কঠিন চীবর দান করা উচিত। ইহা ভবিষ্যতে মহাফল প্রসব করে।

দানের দ্বারা দাতা লৌকিক ও লোকোত্তর সুগতি সুখ লাভ করে; দানে দুঃখ বিনাশ হয়; এমনকি দানে নির্ব্বাণ সম্পত্তি লাভ হয় বলিয়া ভগবান বুদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।

তাই "সন্তোষ চিত্তে দান দেওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।" যেহেতু "দান ও পুণ্য কর্ম্ম সকল পরলোকে মানুষের (প্রাণীর) প্রতি শরণ বা আশ্রয় হইয়া থাকে; সম্পত্তি ও সুখ আনয়ন করিয়া থাকে" ইহাই ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের মহান বাণী।

"সবে সত্তা সুখিতা হোন্তু"

সহায়ক পুস্তকঃ

১। রত্নমালা– শ্রীমৎ গুনালংকার মহাস্থবির।

২। সদ্ধর্ম্মরত্ন চৈত্র– শ্রীমৎ জীনবংশ মহাস্থবির।

৩। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা হইতে সংগৃহীত।

প্রকৃত বৌদ্ধ হওয়ার উপায়

সঞ্জয় চাক্‌মা (বাবু)

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে। এই বিশ্ব মানবতার স্বার্থে প্রত্যেক ধর্ম প্রবর্তকগণ নিজেদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছেন। মানুষও এসব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে যুগ বিবর্তনের পথ ধরে। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে এসেও প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের তেমন খাদ সৃষ্টি হয়নি বরং যুগের সাথে তাল মিলেয়ে ধর্মীয় গরীমাকে সবার উর্ধে তুলে ধরে স্বকীয় সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যের বিকাশে তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। আজ থেকে আড়াই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাব হয়। তার পাঁচশ বছর পর যীশু, তারও পাঁচশ বছর পর হযরত মোহাম্মদ এর আবিভাব হয়। গৌতম বুদ্ধ প্রচার করেন বৌদ্ধ ধর্ম, যীশু খ্রীষ্ট প্রচার করেন খ্রীষ্ট ধর্ম, হযরত মোহাম্মদ প্রচার করেন ইসলাম ধর্ম। বিশ্বের এই প্রধান তিনটি ধর্মের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই বৈজ্ঞানিক, অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং কোনও মতবাদ বির্নিমুক্তবলে প্রতীয়মান। অপর ২টি ধর্মে ঈশ্বর বা সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব সদা-স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মেও "ঈশ্চরের অবতার" স্বীকৃত হয়েছে। তন্মধ্যে বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলা হয়েছে।

লস এঞ্জেলস, কার্ল মাক্স প্রভৃতি আধুনিক সাম্যবাদের জনকরা ধর্ম সমূহের ঈশ্বর এবং অন্যান্য মতবাদের প্রতি অনীহা পোষণ করেছেন। এমনকি অহিফেন, নেশা, শোষনের হাতিয়ার, ভাববাদ ইত্যাদি আখ্যাও দিয়েছেন। তাদের প্রনীত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি পড়ে যে কোন ও উৎসুক ব্যক্তি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার বিপরীতে ধর্মীয় প্রবক্তাগণও ধর্মের সমৃদ্ধি সাধনে বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠেন। ফলে সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম যেমন টিকে আছে তেমন ধর্ম ও সগৌরবে দেদীপ্যমান রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মকে সদ্ধর্ম বলা হয়। সদ্‌ধর্ম অর্থ (সৎ+ধর্ম) সত্যধর্ম। এ ধর্মের মূলে কোন অন্ধবিশ্বাসের ঠাঁই নেই বরং রয়েছে জীবন ও জগৎ ঘনিষ্ঠ প্রকৃত সত্যের বাস্তব ভাবমূর্তি। তাই কার্ল মাক্স এর একটি উদ্ধৃতি প্রনিধান করছি। তিনি বলেছেন- Buddhism cannot certainly be called a religion if by the word religion we mean self of a selfless state, a life of the inanimate world and an inexpressible attachment of the people, But if by religion we understand a path leading to perfection of life,

away of emancipating one self from the innumerable sufferings, then Buddhism is definitely a religion and the best of all religions. (World Buddihism) অর্থাৎ ধর্ম শব্দে যদি নৈরাত্ম্য অবস্থার আত্মা, নিষ্প্রাণ জগতের প্রাণ ও জনগণের অব্যক্ত নেশা বুঝায় তা'হলে বৌদ্ধ ধর্ম ধর্ম নহে। তবে যদি ধর্ম শব্দে আমরা বুঝি জীবনের পূর্ণতার পথ। আমাদের পার্থিব জীবনের অগনিত দুঃখতাপ হতে মুক্তির উপায়। তা'হলে বৌদ্ধ ধর্ম নিশ্চয়ই ধর্ম এবং সকল ধর্মের সেরা ধর্ম।

আজকের প্রগতিশীল মানব মানসে ধর্ম ভিত্তিক সমাজ গঠনের তাগিদ অননুভূত নয়। যদ্দরুন সমাজে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, শিল্পকলায় পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ধর্মীয় অনুশাসনের ছায়াতলে রাষ্ট্র পরিচালনায় নজীর ও দেখা যায়। ধর্মীয় অভিযান ও সাম্রাজ্যাভিযান প্রায় পাশাপাশি রেখে ধর্মযুদ্ধে আত্মদানের ইতিহাসও রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এ ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ধর্ম গুলোর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে এসেছে। সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যাভিযান ছেড়ে ধর্ম অভিযানে ঝোঁক দিয়েছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণে। বৌদ্ধদের দীর্ঘ ও সর্বপ্রাচীন ধর্মেতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, হিংসাকারীদের মাঝে হিংসাহীন, লোভীদের মাঝে নির্লোভ এবং মোহাচ্ছন্নদের মাঝে নির্মোহ হয়ে বসবাস করাই উত্তম। এই শিক্ষাকে পূঁজি করে বৌদ্ধ ধর্ম তিলে তিলে এগিয়ে এসে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আলোর বিপরীতে যেমন অন্ধকার বিরাজমান, তেমনি সত্যের বিপরীতে ও মিথ্যার অস্তিত্ব বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্ম তার স্বকীয় গতিধারায় প্রবাহমান একটি সত্য-সমুদ্র, পূর্ণ মানবতায় পরিপূর্ণ একটি ধর্ম। তাই এই ধর্মের গতিপথে বাঁধার বিন্ধাচল আর থাকল না। বিশ্বময় ঘোষিত হলো- "সংঘং সরনং গচ্ছামি"। জাতি, সম্প্রদায়, গোত্র ভেদাভেদ ভুলে মানুষ যখন বুদ্ধের শরণে এসে ভীড় জমালো তখন মনে হলো জ্বলন্ত মরুভূমিতে সুশীতল ছায়াপ্রদানকারী মহাবৃক্ষই যেন বুদ্ধ প্রবর্তিত সংঘ। সংঘের সারবত্তা সম্পর্কে বুদ্ধ বসলসূত্রে বলেছেন যে-

ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মনো
কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মনো।

অর্থাৎ বসল বা চন্ডাল কুলে জন্ম নিলে সে চন্ডাল হয় না। ব্রাহ্মন কুলে জন্ম নিলে ব্রাহ্মন হয় না। কর্মের দ্বারাই চন্ডাল অথবা ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। তদ্রুপ বৌদ্ধ পরিবারে

জন্ম নিয়ে যদি অবৌদ্ধচিত আচরণের দ্বারা কারো চরিত্র কলুষিত থাকে, তা'হলে তা'কে অবৌদ্ধই বলা যাবে। সে বৌদ্ধ নয়। বৌদ্ধ হতে হলে কি কি কর্ম সাধন করতে হবে? সে সম্পর্কে বৌদ্ধ মাত্রেরই যৎকিঞ্চিৎ ধারণা থাকা চাই। বৌদ্ধ হতে হলে প্রথমেই বুদ্ধের জীবনী, ধর্ম বিনয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আয়ত্ব করা দরকার। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণসহ বুদ্ধদেশিত শীলাদি (নীতি) গ্রহণ করা হয়। বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘরত্ন ভেদে ত্রিরত্নও বলা হয়। রতন সূত্রে এই ত্রিরত্নকে দেব ব্রহ্ম ও মনুষ্য লোকের মধ্যে বিরাজমান সকল রত্নের সেরারত্ন রূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

বৌধ+বোধি+বৌদ্ধ+বুদ্ধ প্রায় সমার্থক হলেও অর্থগত ফারাক রয়েছে। যেমন বোধ অর্থ জাগরণ বা চেতনা। বোধি অর্থ জাগৃতি বা জ্ঞান। বুদ্ধ অর্থ (Enlightened) জাগ্রত অনন্তজ্ঞানী। বৌদ্ধ অর্থ জ্ঞানের সাধনাকারী বা বুদ্ধের অনুসারী। বুদ্ধকে আর্যও বলা হয়। এখানে আর্য কোন জাতিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আর্য অর্থ শ্রেষ্ঠকেই বোঝানো হয়েছে। বুদ্ধদেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্য সত্যে আর্য শব্দটি শ্রেষ্ঠার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ গৃহী বৌদ্ধ গণ আর্য নহেন। চারি আর্যসত্য অধিগতগণ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে আরূঢ় লোকোত্তর মার্গীগণ ব্যতিরেকে সকলেই পৃথকজন বলে গণ্য হন। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখতে পাই যে, বুদ্ধ বিশ্ব মানবকে (১) আর্য ও (২) পৃথকজন ভেদে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন। যারা আর্য তারাই প্রকৃত বৌদ্ধত্ব অর্জন করেন। এক্ষেত্রে প্রকৃত বৌদ্ধত্বের স্বরূপ উদঘাটন করতে গেলে সাত ও আট প্রকারের আর্যের হদিচ পাই। যেমন প্রথম সাতজন হলেন, (১) সম্যক সম্বুদ্ধ, (২) প্রত্যেক বুদ্ধ, (৩) উভয়ভাগ বিমুক্ত পুদগল, (৪) প্রজ্ঞাবিমুক্তি পুদ্‌গল, (৫) কায়সাক্ষী পুদ্‌গল, (৬) দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদগল, (৭) শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদগল। দ্বিতীয় ৮ জন হলেন–

স্রোতাপত্তি	সকৃদা গামী	অনাগামী	অর্হৎ
১ মার্গস্থ	৩ মার্গস্থ	৫ মার্গস্থ	৭ মার্গস্থ
২ ফলস্থ	৪ ফলস্থ	৬ ফলস্থ	৮ ফলস্থ

পৃথকজন বা পুথুজ্জনগণ সচরাচর মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন থাকেন। তাদের মধ্যে যখন সম্যক দৃষ্টির প্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে ক্রমান্বয়ে তারাও আর্য হতে পারেন। সাধারণ বৌদ্ধ গণই প্রকৃত বৌদ্ধত্বে উন্নীত হন। তাই সাধারণ বৌদ্ধদের মাঝে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বীজ উপ্ত করার প্রয়োজনে "আদর্শ" উপস্থাপন অপরিহার্য। এই আদর্শই একজন সাধারণ মানুষকে আদর্শ মানুষে উন্নীত করে তোলে। ত্যাগ,

পরোপকার, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রভৃতিই "আদর্শ"। সর্বোপরি গৃহীদের নিত্য প্রতিপাল্য পঞ্চশীল। যেমন– (১) প্রানাতিপাত না করাঃ সকল প্রাণীর প্রতি সদয় ও সহানুভূতি মূলক মনোভাব পোষণ করা। (২) অদত্ত বস্তু না নেয়াঃ কারো সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ মূলক হিংসা পোষণ না করা। (৩) মিথ্যা না বলাঃ সত্যের সান্নিধ্যে থাকা, (৪) মিথ্যা কামাচার না করাঃ কামনা বাসনাকে সংযত রাখা। (৫) মাদক সেবন না করাঃ মাদক দ্রব্য সেবনের দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট না করা। উল্লেখ্য যে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় সমকালীন বিশাখা, মেণ্ডক, নাগদত্ত প্রভৃতি আর্যগণ সর্বদাই পঞ্চশীল সুরক্ষা করতেন। ভুলেও পঞ্চশীল ভংগ করতেন না। তাই প্রকৃত বৌদ্ধ হতে হলে প্রথমে পঞ্চশীল পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।এতে করেই লোকোত্তর মার্গান্বেষী হওয়া যায়। অংগুত্তর নিকায়ের দশধর্ম সূত্রে বলা হয়েছে যে, পৃথকজন মাত্রেই যদি উক্ত দশধর্ম অধিগম করতে পারেন তা' হলে সে প্রকৃত বৌদ্ধত্বে উন্নীত হবেন। সেই দশধর্ম নিম্নরূপঃ– (১) ত্রিরত্নের শরণাগত থাকেন। (২) নিজের জীবনের একমাত্র সম্বল ও ব্রত হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করেন। (৩) জীবনের বিনিময়ে হলেও বৌদ্ধ ধর্ম রক্ষা করেন। (৪) কায়ের দ্বারা প্রাণাতিপাত, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কর্ম করেন না, বাক্যের দ্বারা মিথ্যা, পরুষ, ভেদ ও সম্প্রলাপ ভাষন করেন না। (পঞ্চশীল অন্তর্ভূক্ত)। (৫) "সৎকর্মে মঙ্গল হয়" এই সত্যে সম্যক বিশ্বাসী হন। (৬) ঈর্ষা, শঠতা ও প্রবঞ্চনা করেন না। (৭) সমদৃষ্টি বা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে সকল ভেদাভেদ বিরহিত সম্মিলিত জীবন–যাপন করেন। (৮) যথাসাধ্য দান করেন, যদ্বারা ধর্মের ও মানব সমাজের কল্যাণ হয়। (৯) সংঘের সুখে সুখী এবং সংঘের দুঃখে দুঃখী হন। অর্থাৎ সংঘের কল্যাণে সদা নিয়োজিত থাকেন। (১০) বুদ্ধ শাসনের (বৌদ্ধ ধর্মের) পরিহানী দেখলে তার অভিবৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

বৌদ্ধ ধর্মে বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণদের উদ্দেশ্যে মোক্ষ প্রদ বিনয় নীতি বা অভিধর্ম দেশনা করার পাশাপাশি গৃহীদের জন্যেও বিভিন্ন সূত্রে বিস্তর উপদেশ প্রজ্ঞাপ্ত রয়েছে। যেমন– সিগা্লক সূত্র, সপ্ত অপরিহানীর ধর্ম, বিধূর পন্ডিতের উপদেশ, বিশাখার প্রতি বুদ্ধের উপদেশ, ব্যগঘপজ্জ সূত্র প্রভৃতি। প্রকৃত বৌদ্ধত্বের স্বরূপ উদঘাটন করার বিষয়টি তাই কোনও ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বিশাল বৌদ্ধ ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অর্নবে এর সন্ধান নিহিত রয়েছে।

অমৃত ধারা

মুরতি সেন চাকমা

মহাকারুনিক ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ মহাকালরূপে দর্শন করে জীবন ও সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিত্তে বিরাগীভাব উৎপন্ন হলে ভব দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষনে গৃহত্যাগী হয়ে গয়াবনে ছয় বছর যাবত কঠোর সাধনাও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর ইস্পিত দুঃখ মুক্তির পথ আবিস্কারের দ্বারা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে পরম সুখের সাথে অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অহরহ দুঃখে নিষ্পেষিত, আত্মভিমানে মোহিত মানবগণের প্রতি করুনা বশতঃ নব লোকত্তর সত্য ধর্ম মহাব্রহ্মার প্রার্থনা ও অনুরোধে প্রচার করার মনস্থ করেন। তিনি সর্ব প্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট পরম সুখ নির্বান ধর্ম প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর যাবত জগতের বহু স্থানে এ সত্য ধর্ম প্রচার করে কোটিশত দেব-মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করে জগত পূজ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ভগবান বুদ্ধের সে সত্যের পথ অবলম্বনে জীবন ও অঙ্গ পরিত্যাগের দ্বারা পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধনপাতা ও দিঘীনালার গভীর অরণ্যে সুদীর্ঘ বার বছরাধিককাল ধৈর্য্য ও বীর্য্যের সহিত সাধনা দ্বারা সেই সুখের সন্ধান পেয়ে তা নিজ অভিজ্ঞায় অধিগম করে বর্তমান হিংস্রতার যুগে অহিংসার বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমান যুগের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে বাস্তব উপমার দ্বারা বুদ্ধের সেই পরম সত্যকে সহজ, সরল ও বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেন, যা শ্রবনে মুহূর্তের জন্য হলেও চিত্তে সুখ ও শান্তির আবির্ভাব হয়। যিনি তাঁর মহান উপদেশ প্রসন্ন চিত্তে ও জ্ঞানযোগে শ্রবন করবেন, তিনি নিশ্চিত গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত ঐ শ্রুত বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে অনুধাবন করে অবধারণ করার চেষ্টা করবেন। আর যিনি অপ্রসন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে তাঁর ঐ মহৎ উপদেশ শ্রবন করবেন, তিনি ঐ দুলর্ভ বিষয় অনুশীলনের কথা দুরে থাকুক, ভন্তের সাহচর্য্য থেকে অন্তর্হিত হওয়ার সাথে সাথে কুশল চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে অকুশল চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ফলে ইহকালেও তিনি দুঃখ ভোগ করেন এবং সেই দুঃখ পরকালে তাকে অপায়গমনে সহায়তা করে।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- "স্বধর্ম শ্রবন বড়ই দুর্লভ"। জগতে বুদ্ধ, বুদ্ধাদি সৎপুরুষ দর্শন না হলে স্বধর্ম শ্রবন করা যায় না এবং চারি আর্যসত্য লাভ না হলে শত সহস্র জন্মেও দুঃখ রোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এযুগে উপযুক্ত সুযোগ

হাতের কাছে পেয়েও যারা বুদ্ধাদি সৎপুরুষ দর্শনও স্বধর্ম শ্রবন হতে বিরত থাকছেন, তাদের ন্যায় দুর্ভাগা এই জগতে কেবা আছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায়ই বলেন, তোমরা চিত্তে জ্ঞান উৎপন্ন কর। যে কোন লোকের চিত্তে জ্ঞান-অজ্ঞান দু'টোই থাকে। যে লোকের চিত্তে জ্ঞান উৎপন্ন হবে তার গতি হবে নির্ব্বান মুখী আর যার চিত্তে জ্ঞানউৎপন্ন হবেনা, চিত্ত সবসময় অজ্ঞানে কলুষিত থাকবে, তখন সেই ব্যক্তির গতি হবে অপায় মুখী এবং সে ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তর ভবনদীতে হাবুডুবু খেতে খেতে অসীম দুঃখ ভোগ করবে।

এক পবিত্র দিন, সেদিন বনভন্তে বলেন, তোমরা আমার কথা মনযোগ দিয়ে শুন- কথাগুলো যাকে পাবে তাকেই বলবে। তিনি বলেন, এপাড়-ওপাড়, মধ্যখানে পাপ নদী। এই নদীতে হাবুডুবু খেতে খেতে তোমরা সীমাহীন দুঃখ পাচ্ছ। আর দুঃখ নয়। তোমাদের এখন সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ গ্রহণ করে তোমরা এপাড়, অথবা ওপাড়ে উঠে এসো। যে কোন পাড়ে উঠতে না পারলে তোমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। জেনে রেখ, নদী খুবই খরস্রোতা। একবার নদীর স্রোতে ভেসে গিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ হলে সহজে কুল পাবার আশা নেই। তিনি এপাড়কে ভব, ওপাড়কে নির্বান, নদীর স্রোতকে অপায় দ্বার এবং সমুদ্রকে চার অপায় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অপায় যোনী অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ। একবার অপায় যোনীতে ধারণ করলে তথা হতে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই শ্রদ্ধেয় ভন্তে সকলের প্রতি করুনা বশতঃ সকলের অপায় গমন রোধ করে দুঃখ হতে মুক্তি দানের জন্যে অনর্গল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অন্য একদিন ভন্তে বলেন, কেহ পাপের সাথে, কেহ পূণ্যের সাথে সুখ ভোগ করে। আবার কেহ আছেন যিনি শুধু নির্ব্বাণের সাথে সুখ ভোগ করেন। যেই ব্যক্তি পাপের সাথে সুখ ভোগ করে সে ইহকালে চরম দুঃখ ভোগ করে পরকালে অপায় গমন করে অকল্পনীয় দুঃখ ভোগ করবে। যেই লোক পুণ্যের সাথে সুখ ভোগ করে সে ইহকালে সুখে সাচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর পর পুণ্যের তারতম্যানুসারে স্বর্গ ও মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়ে স্বর্গে স্বর্গ সম্পত্তি, মনুষ্যকুলে মনুষ্য সম্পত্তি লাভ করে বিপুল সুখভোগ করে। আর যিনি নির্বাণের সাথে সুখ ভোগ করেন তিনি ইহকালেও সপাদিশেষ নির্ব্বাণ সুখে থাকেন এবং মৃত্যুর পর অনুপাদিশেষ নির্ব্বান সাগরে নির্ব্বাপিত হন যেখান হতে আর ভবে পুনরাগমন হয় না। তৃষ্ণা পুনঃ পুনঃ দুঃখ দেয়। স্বর্গ ও মনুষ্যকুলে জন্ম ধারণ করলেও তৃষ্ণা থাকার কারণে পুনরায় চরম দুঃখ ভোগ করার

সম্ভবনা থাকে বলে সৎপুরুষগণ স্বর্গ ও মনুষ্য সুখ কামনা করেন না। সৎপুরুষগণ তৃষ্ণা ক্ষয়ে নির্ব্বাণ কামনা করেন এবং প্রচেষ্টার দ্বারা নির্ব্বাণ সুখ লাভ করেন।

অপর একদিবসে বনভন্তে বলেন, তোমরা দুঃচিন্তা পরিত্যাগ করে সুচিন্তা দ্বারা অবস্থান করবে। দুঃচিন্তা পাপ উৎপন্ন করে। সুচিন্তা পুণ্য অর্জনে সাহার্য্য করে। দুঃচিন্তা চার অপায়ে নিয়ে যায় আর সুচিন্তা চিরতরে দুঃখ মোচন করায় অথবা চিরতরে দুঃখ মোচন না হলেও দুঃখ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে।

অন্য এক পবিত্র দিনে ভন্তে বলেন, তোমরা অদ্য উপোসথ পালন করতে এসেছো, উপোসথ সুন্দরভাবে পালন করে যাও। উপেসথ পালনে যেই পুন্য অর্জন হচ্ছে, এই পুণ্যের উপনিশ্রয় উপোসথ পালন। পুণ্য লাভের হেতু উপোসথ পালন। উপনিশ্রয় ও হেতু এদু'টো প্রত্যয়ের অনুশীলন করতে গিয়ে আমি এরকমই বুঝেছি যে, পুণ্যের আশ্রয় উপনিশ্রয় এবং পুন্যের লক্ষ্য হেতু। এ দু'টোর কার্যকারীতা সোজা ও বাঁকা পথে এবং সময়ের ব্যবধানে চলে, আবার হেতু পাপ ও পুণ্য দু'টিতেই সংযোগ রয়েছে। এজন্য আমার মনে উদয় হলো যে, আমরা ভন্তেকে লিখিত বা মৌখিক প্রার্থনা করার সময় বলে থাকি "এ পূণ্যের ফলে জগতের সকল প্রাণীর নির্ব্বাণ লাভের হেতু হোক"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরাসরি প্রার্থনা। "এ পুণ্যের ফলে জগতের সকল প্রাণী নির্ব্বাণ লাভ করুক"। হওয়া উচিৎ বলে আমি করি। তবে উপনিশ্রয় ও হেতু প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা ব্যাপক। তাই সামান্যতম জ্ঞানে আমার পক্ষে এ দু'টোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

কোন একদিন শ্রদ্ধেয় ভন্তে দৃষ্টি সম্পর্কে বলেন। দৃষ্টি চারি প্রকার যথা- (১) সৎকায় দৃষ্টি, (২) উৎছেদ দৃষ্টি, (৩) শ্বাশত দৃষ্টি এবং (৪) অক্রিয় দৃষ্টি। সৎকায় দৃষ্টির কারণ দুঃখে অজ্ঞানতা, উচ্ছেদ দৃষ্টির কারণ দুঃখ সমুদয়ে অজ্ঞানতা, শ্বাশত দৃষ্টির কারণ দুঃখ নিরোধে অজ্ঞানতা, এবং অক্রিয় দৃষ্টির কারণ দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদায় অর্থাৎ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অজ্ঞানতা। এ চারি দৃষ্টির কারণে দুঃখের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হয় এবং দুঃখ ভোগের শেষ হয় না। শ্রদ্ধেয় ভন্তে অক্রিয় দৃষ্টি বুঝাতে গিয়ে বলেন, কোন একদিন জনৈক গৃহী বহু দানীয় সামগ্রী নিয়ে বন বিহারে আসে। যথারীতি সে দান কার্য সম্পাদন করে বাড়ীতে চলে যায়। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে সে লোকজনকে নাকি বলে বেড়ায় অনর্থক ভন্তেকে দান দিয়ে এসেছি, টাকা গুলো খরচ না করাই ভালোছিল। দান দিয়ে লোকটা যেই পুণ্য অর্জন করেছিল সেই পুণ্য তার একটা কটুক্তিতেই নিঃশেষ করে ফেললো। উপরন্তু পুণ্যের বদলে পাপই উৎপন্ন করলো।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে সেই লোকটার কর্মের ধরন সম্পর্কে বলেন, মনে কর, তোমরা অনেক টাকা খরচ করে উন্নতমানের কাঠ দিয়ে একটা সুন্দর আলমিরা তৈয়ারী করে তা একটা কুঠার দ্বারা সংগে সংগে টুকরা টুকরা করে ফেললে? তা কি আর ব্যবহারের যোগ্য থাকবে? না, তা আর ব্যবহারের যোগ্য থাকবে না। ঠিক তদ্রুপ লোকটা পূর্ণ্য অর্জন করেও তা আবার একটা কটুক্তিতেই নিঃশেষ করে ফেললো। এমতাবস্থায় দান সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জেনে নেওয়া সকলের উচিৎ। দান, দানের ফল সম্পর্কে জ্ঞান রেখে দান করলে সে দান হবে উত্তম দান ও মহাফল দায়ক।

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞানীর আচরিয় ধর্ম। তাই তিনি ধর্মকে অচিন্তনীয় বলে গেছেন। জ্ঞানের পরিধি যার যতবেশী সে ততবেশী তাঁর ধর্ম বুঝবে। একদিন শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, তোমরা "অন্তরদৃষ্টি ভাব" উৎপন্ন কর। অন্তরদৃষ্টি ভাব উৎপন্ন করা না গেলে আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শুদ্ধি লাভ হবে না। "অন্তরদৃষ্টি" অর্থ হলো নিজের মনের প্রতিদৃষ্টি রাখা বা মন যাঁছাই করা, নিজের কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও যাঁছাই করা এবং ভোগের লিপস্যা বাড়তে না দেওয়া বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে অনাসক্ত রাখা ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতি সজাগ থাকা।

জীবন বড়ই ক্ষনস্থায়ী ও দুঃখময়। বারংবার জীবন ধারণে যেই দুঃখের উৎপত্তি হয় সেই দুঃখকে বীভৎস রূপে দর্শন করে, দুঃখ নিঃশেষ করার আকাঙ্খা নিয়ে বুদ্ধের সেই উত্তম পন্থা অবলম্বন করে যিনি দুঃখের অন্তসাধন করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহৎ, তিনিই সৎপুরুষ, তিনিই মহাপুরুষ। এই যুগে যিনি ঐ সকল গুনে গুনান্বিত তাঁর নীতি ও পথ অনুসরণ করে চলা এবং তাঁর উপদেশ ও অনুশাসনে ধর্মীয় ভাবে জীবন যাপন করা অতীব উত্তম পন্থা বলে সধর্মপ্রাণ সকলের একবাক্যে কথাটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

"সকল প্রাণী সুখী হোক"

সাধু - সাধু - সাধু।

শিশুকাল থেকে সন্তান সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে অভিভাবকদের ভূমিকা

রিটন কুমার বড়ুয়া
বি. এ. (অনার্স), এম. এ, বি. এড (১ম শ্রেণী)
সহকারী শিক্ষক
রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে একটি মানব শিশুর লালন পালনে পিতামাতার ভূমিকা অবর্ণনীয়। এই মানব শিশুর যখন বয়োঃবৃদ্ধি ঘটতে থাকে তখন পিতামাতা তথা অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হয় তার শিক্ষা-দীক্ষার উপর। একজন সচেতন শিক্ষিত অভিভাবক সব সময় চান যে, তার শিশুটি লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। লেখাপড়া শিক্ষাদানের ব্যাপারে অভিভাবকের পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাও কম নয়- তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

কিন্তু একজন শিশু শুধু লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে হয় না। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে, সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হলে তাকে ধর্মীয় আচার-আচরণও আয়ত্ব করতে হয়। আর এই ধর্মীয় জ্ঞান তথা শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের চেয়ে অভিভাবকের ভূমিকাই বেশী। একটি শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন আস্তে আস্তে তার মধ্যে ধর্মীয় বোধও জাগ্রত হয় এবং তা সে তার পরিবার থেকে অর্জন করে থাকে। পরিবারে পিতামাতা ও পারিবারিক অন্যান্য সদস্যদের ধর্মীয় আচরণ তার উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। অর্থাৎ যে পরিবারে পিতামাতা, ভাইবোন ধর্মীয় জ্ঞান রাখে সেই পরিবারের শিশুটি তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান না রাখা পরিবারের শিশুর চেয়ে বেশি ধর্মীয় আচরণ আয়ত্ত করে। আর সেই কারণে দেখা যায় যে, একজন মুসলিম পরিবারের শিশুর চেয়ে একজন বৌদ্ধ বা হিন্দু পরিবারের শিশুর অনুভূতি, ধর্মীয় বোধ এবং আচরণ কম কারণ মুসলিম পরিবারে দেখা যায় যে, অভিভাবক বা পিতামাতা যতই অশিক্ষিত হোক না কেন তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, কোরাণ তেলাওয়াত ইত্যাদি করার চেষ্টা করে। ফলে সেই পরিবারের শিশুটিও তা অনুসরণ করে থাকে।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধ পরিবারে এ ধরনের কোন ধর্মীয় আচরণ পিতামাতা বা ভাইবোনদের মধ্যে ঐ-ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি তারা নিয়মিত মন্দিরেও আসেন না। অথচ একজন মুসলিম পরিবারের অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য

শ্রদ্ধেয় ভন্তে সেই লোকটার কর্মের ধরন সম্পর্কে বলেন, মনে কর, তোমরা অনেক টাকা খরচ করে উন্নতমানের কাঠ দিয়ে একটা সুন্দর আলমিরা তৈয়ারী করে তা একটা কুঠার দ্বারা সংগে সংগে টুকরা টুকরা করে ফেললে? তা কি আর ব্যবহারের যোগ্য থাকবে? না, তা আর ব্যবহারের যোগ্য থাকবে না। ঠিক তদ্রূপ লোকটা পূর্ণ্য অর্জন করেও তা আবার একটা কটুক্তিতেই নিঃশেষ করে ফেললো। এমতাবস্থায় দান সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জেনে নেওয়া সকলের উচিৎ। দান, দানের ফল সম্পর্কে জ্ঞান রেখে দান করলে সে দান হবে উত্তম দান ও মহাফল দায়ক।

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম জ্ঞানীর আচরিয় ধর্ম। তাই তিনি ধর্মকে অচিন্তনীয় বলে গেছেন। জ্ঞানের পরিধি যার যতবেশী সে ততবেশী তাঁর ধর্ম বুঝবে। একদিন শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, তোমরা "অন্তরদৃষ্টি ভাব" উৎপন্ন কর। অন্তরদৃষ্টি ভাব উৎপন্ন করা না গেলে আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শুদ্ধি লাভ হবে না। "অন্তরদৃষ্টি" অর্থ হলো নিজের মনের প্রতিদৃষ্টি রাখা বা মন যাঁছাই করা, নিজের কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও যাঁছাই করা এবং ভোগের লিপস্া বাড়তে না দেওয়া বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে অনাসক্ত রাখা ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতি সজাগ থাকা।

জীবন বড়ই ক্ষনস্থায়ী ও দুঃখময়। বারংবার জীবন ধারণে যেই দুঃখের উৎপত্তি হয় সেই দুঃখকে বীভৎস রূপে দর্শন করে, দুঃখ নিঃশেষ করার আকাঙ্খা নিয়ে বুদ্ধের সেই উত্তম পন্থা অবলম্বন করে যিনি দুঃখের অন্তসাধন করেছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহৎ, তিনিই সৎপুরুষ, তিনিই মহাপুরুষ। এই যুগে যিনি ঐ সকল গুনে গুনান্বিত তাঁর নীতি ও পথ অনুসরণ করে চলা এবং তাঁর উপদেশ ও অনুশাসনে ধর্মীয় ভাবে জীবন যাপন করা অতীব উত্তম পন্থা বলে সধর্মপ্রাণ সকলের একবাক্যে কথাটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

"সকল প্রাণী সুখী হোক"

সাধু – সাধু – সাধু।

শিশুকাল থেকে সন্তান সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে অভিভাবকদের ভূমিকা

রিটন কুমার বড়ুয়া
বি. এ. (অনার্স), এম. এ, বি. এড (১ম শ্রেণী)
সহকারী শিক্ষক
রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে একটি মানব শিশুর লালন পালনে পিতামাতার ভূমিকা অবর্ণনীয়। এই মানব শিশুর যখন বয়োঃবৃদ্ধি ঘটতে থাকে তখন পিতামাতা তথা অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হয় তার শিক্ষা-দীক্ষার উপর। একজন সচেতন শিক্ষিত অভিভাবক সব সময় চান যে, তার শিশুটি লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। লেখাপড়া শিক্ষাদানের ব্যাপারে অভিভাবকের পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাও কম নয়- তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

কিন্তু একজন শিশু শুধু লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে হয় না। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে, সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হলে তাকে ধর্মীয় আচার-আচরণও আয়ত্ব করতে হয়। আর এই ধর্মীয় জ্ঞান তথা শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের চেয়ে অভিভাবকের ভূমিকাই বেশী। একটি শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন আস্তে আস্তে তার মধ্যে ধর্মীয় বোধও জাগ্রত হয় এবং তা সে তার পরিবার থেকে অর্জন করে থাকে। পরিবারে পিতামাতা ও পারিবারিক অন্যান্য সদস্যদের ধর্মীয় আচরণ তার উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। অর্থাৎ যে পরিবারে পিতামাতা, ভাইবোন ধর্মীয় জ্ঞান রাখে সেই পরিবারের শিশুটি তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান না রাখা পরিবারের শিশুর চেয়ে বেশি ধর্মীয় আচরণ আয়ত্ত করে। আর সেই কারণে দেখা যায় যে, একজন মুসলিম পরিবারের শিশুর চেয়ে একজন বৌদ্ধ বা হিন্দু পরিবারের শিশুর অনুভূতি, ধর্মীয় বোধ এবং আচরণ কম কারণ মুসলিম পরিবারে দেখা যায় যে, অভিভাবক বা পিতামাতা যতই অশিক্ষিত হোক না কেন তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, কোরাণ তেলাওয়াত ইত্যাদি করার চেষ্টা করে। ফলে সেই পরিবারের শিশুটিও তা অনুসরণ করে থাকে।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধ পরিবারে এ ধরনের কোন ধর্মীয় আচরণ পিতামাতা বা ভাইবোনদের মধ্যে ঐ-ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি তারা নিয়মিত মন্দিরেও আসেন না। অথচ একজন মুসলিম পরিবারের অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য

পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্যে প্রতিদিন মস্‌জিদে যেতে না পারলেও অন্তত শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায় করার জন্যে তার সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে মস্‌জিদে যাবার চেষ্টা করেন। আর সে কারণে সেই পরিবারের শিশু ধর্মীয় আচার আচরণ আয়ত্ত করে থাকে, অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে।

যা হোক আমার বর্তমান আলোচনা মুসলিম বা হিন্দু পরিবারের শিশুর সঙ্গে বৌদ্ধ পরিবারের শিশুর ধর্মীয় আচরণের তুলনা নয়। আমার আলোচনা আমাদের বৌদ্ধদের শিশুরা শিশুকাল থেকে কিভাবে এবং কি কি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার এই শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের ভূমিকা কতটুকু তাই নিয়ে।

ধর্ম মানবজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। ধর্ম মানুষের পরম সম্পদ এবং ত্রিভূবনের দুঃখ বিনাশের উপায়। শিশুকালই ধর্ম শিক্ষার উপযুক্ত সময়। কারণ শিশুকালে মনের মধ্যে ধর্মের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত না হলে ভবিষ্যৎ জীবনে ঐ শিশুটি কখনও ধর্ম পরায়ণ মানুষ রূপে পরিগণিত হতে পারবে না তথা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। তাই শিশুকাল থেকে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করানো প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

"রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কাঁথা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে
পলে প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে মহাপুরুষ সম্পর্কে এ উক্তিটি করেছেন তিনি হলেন আমাদের মহাকারণিক গৌতমবুদ্ধ। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র রক্তমাংসের মানুষ যিনি রাজপুত্র হয়ে হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব রেখেছিলেন।

সেই গৌতম বুদ্ধের প্রদর্শিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ পরিবারে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে সেই বৌদ্ধ নামে পরিচিত হয়। বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যদি সে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন সম্পর্কে কিছুই না জানে তবে তার বৌদ্ধ পরিচয়টি যথার্থ হয় না। তাই শিশুকাল থেকে প্রত্যেক বৌদ্ধ সন্তান সন্ততিকে বুদ্ধের দর্শন, ধর্মীয় অনুশাসন, আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। আর এই শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। কারণ একজন শিশুর যখন আস্তে আস্তে বয়স ও বুদ্ধি বাড়তে থাকে তখন সে প্রথমে অভিভাবকদের কাছ থেকে ধর্মীয় আচরণের শিক্ষা পায়। একজন অভিভাবক যদি তার শিশুকে ত্রিরত্ন বন্দনা, ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, ভিক্ষুবন্দনা ইত্যাদি পালি ভাষায় আবৃত্তি করে না শুনান তবে সে কিছুতেই তা শিখতে পারবে না। তাছাড়া প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা যদি তার অভিভাবক তাকে পরিবারে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি বা ছবির সম্মুখে বন্দনা করতে না শেখান, মন্দিরে গিয়ে বা বাড়ীতে ভিক্ষুকে বন্দনা করতে না শেখান তবে তা তার অভ্যাসে পরিণত হবে না। বড় হলে এ বিষয়ে তার মধ্যে জড়তা থেকে যাবে।

প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য একজন শিশু, যে বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তাকে বাড়ীতে অথবা নিকটবর্তী বিহারে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধ বন্দনা, ত্রিশরণ, ভিক্ষু বন্দনা, পঞ্চশীল ইত্যাদি পালি ভাষায় শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে শেখানো ও এ সকল সম্বন্ধে জ্ঞান দান করানো। বিহারে গেলে ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কে তার ধারণা জন্মাবে।

বাল্যকাল থেকে একজন শিশুকে সম্ভব হলে শারীরিক সুস্থতার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন উপোসথ দিবসে অষ্টশীল গ্রহণ করানো। ফলে বড় হলে আর তাকে অষ্টশীল গ্রহণ সম্পর্কে বলতে হবে না।

একজন শিশুর চরিত্র গঠনের জন্যে, চরিতমালা, জাতক থেকে নীতিমূলক গল্প, বোধিসত্ত্বের মানব হিতৈষণার গল্প ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া বৌদ্ধদের পালিত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব কেন পালিত হয় ইত্যাদি সম্পর্কে, বৌদ্ধদের তীর্থ স্থান সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপিটক সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও কিছু জানেন না– এটা অপ্রিয় হলেও সত্য। অথচ মুসলিম ধর্মাবলম্বী একটা শিশু, যার লেখাপড়া পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সেও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'কোরান' সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। এটা সম্ভব হচ্ছে এ কারণে যে, তাদের অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের বাল্যকাল থেকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার মানসে অন্তত আর কোন কিছু শেখাতে না পারলেও কোরাণ তেলাওয়াত শেখানোর চেষ্টা করেন।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকাল থেকে সন্তান সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে অভিভাবকদের ভূমিকা অপরিসীম।

যা হোক, যে কোন ধর্মের যে কোন শিশুর সামাজিক মূল্যবোধ, মানসিক বর্ধন সৃষ্টি করার পেছনে ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য। ধর্ম মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, সুশৃঙ্খল করে। আর তার এ ধর্মীয় আচরণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। আজকের সভ্য জগতে বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির ফলে ধর্মীয় আচরণ ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আমরা আমাদের শিশুদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছি। ফলে ভবিষ্যৎ এ প্রজন্মরাই বড় হয়ে সমাজে সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানিসহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে সমাজের শান্তি বিনষ্ট করেছে এবং সমাজকে কলুষিত করছে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের প্রয়োজন শিশুকাল থেকে তাদের সন্তান সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলে সমাজ থেকে অশান্তি দূর করা।

বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্দৃষ্টি ভাব

মায়া সীতা চাকমা

মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মের আসল রূপ হলো- নিজেকে জানা, নিজেকে দেখা বা দর্শন করা। অর্থাৎ নিজের চিত্তের ভিতরে কি কি দুষণীয় পদার্থ বা আগাছা-পরগাছা রয়েছে সেগুলো এক একটি বাছাই করে মুলোৎপাদন করা। যেমন- ভগবান বুদ্ধ এক সময় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন- 'হে ভিক্ষুগণ তোমরা আগে বনের বৃক্ষ ছেদন কর'। ভিক্ষুরা বুদ্ধের উপদেশ শুনে দা-কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে জংগলের দিকে অগ্রসর হলেন- ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুরা তার কথা বুঝতে পারেন নাই দেখে বুদ্ধ আবার বললেন- 'হে ভিক্ষুগণ কোথায় যাচ্ছ?' প্রতি উত্তরে ভিক্ষুরা বললেন- 'এইমাত্র বললেন, আমাদের বনবৃক্ষ ছেদন করার জন্য তাই গাছগুলো কাটতে জংগলের দিকে যাচ্ছি।' ইহা শুনে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে দেশনা করলেন- 'বন বৃক্ষ বলতে জংগলের গাছ নয়- মনের বা চিত্তের ভিতরের যে সমস্ত লোভ, রাগ, দ্বেষ-মোহ-অবিদ্যা-তৃষ্ণা-অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি ইত্যাদিকে অর্ন্তদৃষ্টিতে অবলোকন করে শীল-প্রজ্ঞা-অপ্রমাদের দ্বারা সমূলে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চালানো। পরের দোষ, ত্রুটি-ভুল-গলদ-অপরাধকে সমালোচনা কিংবা চোখে আঙ্গুল গুটিয়ে দেখানো নয়। বরং নিজেকে নিজে সমালোচনা করে নিজের ভিতরের ময়লা-আবর্জনাকে এক একটি করে আয়নায় যেমন- নিজের প্রতিচ্ছবি অবলোকন করা যায় ঠিক তদ্রুপ অর্ন্তদৃষ্টির আলোকে বিদ্যারূপ জ্ঞান-সত্যের চক্ষু উন্মীলন করে চিত্ত পরিশুদ্ধি বা বিশুদ্ধ করা। যেমন- রোপিত ধান যদি আগাছা দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তাহলে সে ধান রোপন করা না করার সামিল। লোহার মরিচীকা যেমন লোহাকে ধ্বংশ করে বা নষ্ট করে ঠিক তদ্রুপ নিজের মনের বা চিত্তের ময়লা অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ভরা মনোভাব ও নিজেকে সর্বনাশ বা গ্রাস করে নিজেকে ধ্বংশ করতে থাকে স্বভাবতঃই।'

কাজেই সেই অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন না হলে নিজের চিত্তের দোষণীয় ময়লা পরিস্কার কিংবা পবিত্র না থাকলে এবং শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি মৈত্রীভাব উৎপন্ন না হলে প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম পালন-আচরণ করছি কিংবা শীল পালন করছি বলা যাবে না। এটা শধু লোক দেখানো ধর্ম ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে পরকাল আছে, কর্মফল আছে। কাজেই ইহ জনমে ধর্মের নামে অজ্ঞানতাবশতঃ স্বদ্ধর্ম হারিয়ে পরধর্ম (পাপ ধর্ম) চর্চায়-আচরণে আমরা যারা উঠে পড়ে লেগে আছি প্রতিনিয়ত সে ধর্মতো

প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম নয় বা বুদ্ধের আচরণ নয়। আমরা যে অপবিত্র-অসংযত-অস্থির চিত্ত নিয়ে দুষ্ট মনে দুষ্ট কথা বলে কিভাবে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে ধাবিত হয়ে বুদ্ধের সুনির্দ্দেশিত এবং আবিস্কৃত লৌকিক-লোকোত্তর জ্ঞান লাভের অবলম্বন শমথ এবং বিদর্শন ভাবনা অধিগত করবো? তাই আসুন সকলে আমরা একে অপরের প্রতি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিংসা-বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ না করে অন্যের সমালোচনা-পরনিন্দা-পরচর্চা না করে প্রসন্ন মনে কথা বলে নিজেকে নিজে সমালোচনা বা নিজের দোষ-ভুল-ত্রুটি-অপরাধ শোধ্রানোর চেষ্টা করি। বুদ্ধ এবং বনভন্তের কথায়-

সারাদিন আলাপে-সালাপে দিন কাটাইয়া
সারা রাত্রি নিদ্রা যাইয়া অজ্ঞান ব্যক্তি কি করে মুক্তির পথ অন্বেষণ করিবে?

সকল প্রাণী সুখী হোক
সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

প্রণমি তোমারে হে বুদ্ধ ভগবান

সুগত চাকমা (ননাধন)

যাঁহার অমৃত বাণী লংঘিয়া
গিরি হিমালয়,
পৌঁছিল প্রশান্ত মহা সাগরে
চীনে, জাপানে, দূর দূরান্তে–
যাঁহার অমৃত বাণী
লংঘিল বাধার বিন্ধ্যাচল।
পৌঁছিল ভারত মহাসাগরে
সিংহল হতে দ্বীপে,
দ্বীপান্তরে, –
প্রণমি তোমারে হে লোকত্তর
বুদ্ধ ভগবান।

তব আগমনে শান্তি লভেছে অবণী'
দেশে দেশে যুগে যুগে বুদ্ধবাণী
জ্ঞানী সবে দিয়াছে অমৃতের স্বাদ,
দুঃখেরে চির তিরোহিত করি
পরম নির্বাণ।
প্রণমি তোমারে
হে বুদ্ধ ভগবান।
বুদ্ধের হোক জয়
ধর্মের হোক জয়
সংঘের হোক জয়
হিংসার হোক ক্ষয়
সুখী হোক সর্বপ্রাণী
সুখী হোক ধরণী।
গাহি বুদ্ধের জয়গান
অজ্ঞানতার হোক চির অবসান।
প্রণমি তোমারে হে বুদ্ধ ভগবান।।

বিশ্ব মৈত্রী

যতীন্দ্র লাল কারবারী

এসো সবে মিলি, ভেদাভেদ ভুলি
এ পৃথিবীর মানব জাতি।
বৌদ্ধ–খৃষ্টান, হিন্দু–মুসলমান,
জানাই সবারে সাম্য মৈত্রী।
জাতি ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ,
হাতে হাতে ধরি ভ্রাতৃ– বিশেষ,
গাহি এক সুরে একই কাতারে
মৈত্রী– করুণার জয়ের গীতি।
সবে মিলি মোরা গাহি অনির্বার,
বর্ণ–বৈষম্য করি পরিহার।
আজীবন ধরে, অন্তরে অন্তরে,
সাম্যের বাণী বৌদ্ধ– নীতি।
মানুষ মানুষে নাহি কোন ভেদ্,
জাতির সংশয় করবো উচ্ছেদ্।
এ জগতে শুধু একটা জাতি
সেই জাতিই হবে মানুষ জাতি।
বিশ্ব মানবতা হোক মহান,
রাখ্‌বো অটুট্ চির অম্লান।
একাত্মতার মহা মিলনে
জাগাবো বিশ্বে পরম শান্তি।

বির্দশন জ্ঞান

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দেবমিত্র ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

ক্রোধ হিংসা তন্দ্রালস্য চিত্যানুমোচন,
নামরূপ পরমার্থে সন্দেহ করণ।
নীবরণ উভয়েতে স্মৃতিমান রও,
উদয় বিলয় ক্ষণে সদা জ্ঞাত হও।
এইরূপ করেন যিনি স্মৃতির সাধনা,
বিচ্যুৎ হইবে তার প্রজ্ঞপ্তী ধারণা।
প্রজ্ঞা ভিক্ষু আদি কর্ম ইন্দ্রিয় দমন,
সন্তোষ প্রাতিমোক্ষ শীল আচরণ।
শুদ্ধ জীবি অনলস কল্যাণ আকাঙ্খি,
মিত্রের সংসর্গ তবে হবে অভিলাষী।
আপনার চিত্ত তুমি একাকি দমিবে,
বনান্তে সেইরূপ আনন্দ পাইবে।
আত্মাকে সুদমিত যখনি করিবে,
দুর্লভ অর্হৎ ফল তখন লভিবে।
পার্থিব লাভের মাঝে সুস্থতা প্রধান,
উপশান্ত সুখ হয় পরম নির্ব্বাণ।
মার্গ মাঝে অষ্টাঙ্গিক সবার উত্তম,
অমৃত সমীর তরে ক্ষেম অনুপম।
প্রমোদ্য বহুল হও অর্হৎ যত ভিক্ষু গণ,
লোক হেম পদ তবে মুক্তির কারণ।
সে আমারে গালি দিল গেল মোরে মারি,
ফাঁকি দিল সে আমারে ধন নিল হরি।
এইরূপ চিন্তাধারা করেন পোষণ,
তাদের বৈরিভাব শান্তি হয় না কখন।

এইরূপ চিন্তাধারা করে বিসর্জ্জন,
তাহাদের বৈরিভাব শান্তিতে মোচন।
যাহারা ক্রোধহীন তাহারা স্বর্গ পরায়ণ,
যাহারা কৃপনতাহীন তাহারা স্বর্গ পরায়ণ।
পরমার্থ সত্য জ্ঞান হইলে অর্জন,
সত্যাসত্য জ্ঞান হবে যথার্থ দর্শন।
আধ্যাত্মিক মহাশক্তি জগতে দেখাব,
ক্রোধাৎ যিনি অক্রোধাৎ জগতে শিখাব।

গান

গয়াসুর চাক্‌মা

সুরকার- দিলীপ বাহাদুর

উত্তম দান দানোত্তম কঠিন চীবর দান
পুণ্যবতী উপাসিকা বিশাখারই শ্রেষ্ঠ অবদান।
ছিলেন তিনি দানবতী গৌতম বুদ্ধ কালে
দিনে দিনে সুতা কেটে কঠিন চীবর তৈরী করে
বুদ্ধ শাসনে করেন সেই চীবর দান।
মোরাও সেই বিধিমতে কঠিন চীবর তৈরী করে
করবো আজি সেইদান বুদ্ধ শাসনে
পাবো মোরা এইদানে আর্য্যসত্য জ্ঞান।
হে বুদ্ধ! হে ধর্ম্ম! হে ভিক্ষু সংঘ!
গ্রহণ করে আজি মোদের এই মহান দান
দাও ঢেলে আশীষধারা লভি নির্বাণ।

উত্তর পুরুষের জন্য রচিত পঙ্‌ক্তিমালা

(আত্মজ শ্রী ডরিন তালুকদারকে)

শ্যামল তালুকদার

১.

মহীরুহ হয়ে সুশীতল ছায়া দিও
দুঃখ দিনে দিও অভয় আশ্বাস
মেঘ হয়ে চৈত্রদিনে দিও জল
বুকের ভিতরে গড়ো নিরাপদ আবাস

২.

ফুল থেকে নিও কিছু ঘ্রাণ
নিও প্রাণখোলা হাসি
ঝর্ণার কাছ থেকে নিও কলতান
সাগরের কাছ থেকে নীল রাশিরাশি।

৩.

জ্যোৎস্নার কাছ থেকে নিও কোমলতা
সূর্য থেকে নিও আলো মুঠো মুঠো
অসময়ের অন্ধকারে আলো জ্বেলে
অরুণ হয়ে ওঠো।

৪.

পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের সব উপমা
আকণ্ঠ আহরণ করো
মহাপুরুষের মত যেন বেঁচে থাক চিরকাল
এমনই জীবন গড়ো।

৫.

সময়ের কাজ থেকে নিও কিছুটা সময়
সময়ের হাত ধরে যেতে পারো যেনো
নদীর কাছ থেকে শিখে নিও কিভাবে বয়ে যেতে হয়
মরণে নতুন জীবন এনো।

৬.

মানব জনম বহু সাধনায় পাওয়া
যে কোন সময় হারাতে পারো
সময়ের হেলা না করে সামনে এগো
সন্দেহ তাই এ সময় পাবে কিনা আবারো।

৭.

জীবনে শুধু চাওয়া আর পাওয়া নয়
কিছু না কিছু দিয়ে যেতে হবে
পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন
মানুষের মত কাজ করে যাও তবে।

৮.

জীবনের আয়ু দ্রুত বয়ে যায়
তাই যতদিন দেহে থাকে প্রাণ
নদী হয়ে নিরলস অবিরাম বয়ে যাও
পৃথিবীতে বেঁচে থাক চির অম্লান।

৯.

ফুল হও ফল হও বীজ হও
হও মেঘ হও নদ-নদী
ভোরের পাখি হয়ে কণ্ঠে ধরো গান
ঝর্ণা হয়ে পাহাড় ভেঙে বও নিরবধি।

১০.

সময়ের সকল বাঁধ ভাঙতেই হবে
গেয়ে যেতেই হবে জীবনের গান
মনুষ্য জীবন সার্থক তবেই হবে
সত্যের পথে যদি যায় যাক প্রাণ।

১১.

আজীবন জ্ঞান আহরণ করো
জ্ঞানী-গুণীদের জীবনী থেকে
মরণের পরে সময়ের বুকে
রেখে যাও স্মরণ চিহ্ন এঁকে।

১২.

পৃথিবীতে অস্ত্রের খেলা খেলতে দিও না আর
জগতে চিরশান্তি নিয়ে আসো।
বুদ্ধের অহিংসা মৈত্রী করুণার
আলো জ্বেলে সকল অন্ধকার নাশো।।

কর্মের কর্তা নাই ফলের ভোক্তা নাই

সাধন তালুকদার

কর্মের কর্তা ফলের ভোক্তা
নেই কোন খানে।
চিত্ত চেতনা শুধু বয়ে যায়
কর্মের অবিরল ধারায়
অজর অব্যয় আত্মা অবিনশ্বর
নেই কোন জীবের
কর্ম শক্তি জীবের বিকাশ শুধু ক্ষণিক তরে।
নামরূপ সহযোগে এসে এ বিশ্ব চরাচরে,
কর্ম প্রবাহে চিত্তচেতনা বয়ে যায়,
ফল দিয়ে দিয়ে শুধু বেদনাকে ভোগায়।।
বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারে
বিজ্ঞান চারি মিলি নাম ধরে
এই নাম রূপে অবলম্বনে
উদয় বিলয় ক্ষনে ক্ষনে
বয়ে যায় চেতনার প্রবাহে
চেতনা কর্ম ধারায় বহে
বেদনায় সুখ-দুঃখ ভোগে
রূপের অবলম্বনে।

একটা গোলাপ

প্রতাপ চন্দ্র চাক্‌মা

একটা কাননে ফুটছে এক
সুন্দর গোলাপ ফুল,
জ্ঞান বলে যায় গো চেনা
অজ্ঞান যারা করে ভুল।
সবকাননে এমন গোলাপ
কভু নাহি ফোটে,
সবার চেয়ে ভাগ্যবান যাঁরা
ফোটে তাদের বাগে।
বিলায় শুধু মধুর সুবাস
সে ফুল সারাক্ষণ,
সে সুবাসে আছে মিশে
আর্য্য মার্গ ফল।
নাওগো চিনে জ্ঞানবলে
ওহে মানব কুল,
কোন্‌ কাননে আছে ফুটে
কোন্‌ সেই গোলাপ ফুল।

বন্দনা ও প্রার্থনা

সুনীল কুমার কারবারী

ট্রাইবেল আদাম, রাঙ্গামাটি।

ভন্তে!

শ্রদ্ধাচিত্তে শ্রী চরণে এই নিবেদন
লভি যেন চারি আর্য্য সত্য দর্শন।
দান–শীল–ভাবনাদি করিনু সাদরে
ক্ষয় হোক আমিত্ব লভিয়া বুদ্ধজ্ঞানে।
করেছি সেতু বন্ধন নির্বাণের সাথে
প্রব্রজ্যা লাভ হোক বুদ্ধের ছায়াতে।
অবিদ্যা–তৃষ্ণা ক্ষয় হোক জ্ঞানের বলে
সম্যক দৃষ্টি লভি যেন ইহ–পরকালে।

হে ত্রাতা!

কর তুমি মোরে স্নেহের আশীর্বাদ,
আনির্বাণ পুণ্যে থাকি যেন অপ্রমাদ।
সুখী হোক মুক্ত হোক যত বিশ্ব প্রাণী
ইহ–পরকালে হই যেন বোধিজ্ঞানী।

সাধু – সাধু – সাধু।।

(শ্রদ্ধেয়–পূজনীয় বনভন্তে কর্তৃক স্বীকৃত)

পুণ্যতীর্থ

অশ্বিনী কুমার কারবারী

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

অভ্রভেদী লুসাই পাহাড়

নির্ঝড়িয়ে শিলারস,

পাদমূল হতে তার

জন্ম নিল এক নির্ঝর তটিনী।

খুঁড়ি খুঁড়ি মাটি, নিজপথ কাটি,

বহিয়া চলিছে সর্পিল আকারে

অচিন অজানার দেশে।

বাড়িয়ে নিল ক্ষুদ্র কলেবর

দিল পরিচয়, তার,

নাম– নদী কর্ণফুলী।

পুলিনে যেথায়, বায়ু বহে যায়,

গাহিছে বিহগ গান

যেথা ফুল রাশি, ফুটে হাঁসি হাঁসি,

আপনি ঝড়িয়ে যায়

কালের কপোল তলে।

এ নিবিড় বিজনে, বনভন্তে একামনে,

সদারত ধ্যান সুখে বর্ণিব কেমনে।

এ স্থানে মোদের মুকুট রতন

ত্যাগিয়া যত জাগতিক সুখ,

হয়ে তন্ময়; বিমুক্তির লাগি

এ শান্ত রাজবনে।

নেহারিয়া এ ঋষিরে,

ভক্তিপুত মনে

সম্ভ্রমে নোয়ায় শির,

কতোশত জনে।

ভাসে হৃদে কত স্মৃতি, কত পুণ্য কথা,

কত বরষের হায়! কতশত ব্যথা।

সপ্ততি সপ্তম বর্ষ বয়স

করি অতিক্রম

ছাড়ি "ধনপাতা" তব জন্ম স্থান,

ভ্রমিয়াছ দিঘীনালা, লংগদু

আরো কত নগর গ্রাম।

বেছে নিলে কি শেষে

জীবনের মনোপুত নিবাস তোমার

এ রাঙ্গামাটি রাজবন?

পঞ্চচত্বারিংশ বছর

কাটিয়ে ভিক্ষু জীবন,

লভিয়াছ যে ধর্ম্ম তত্ত্ব জ্ঞান,

না রাখি ভেদাভেদ আপন পর

বিতরিব অকাতরে,

জনহিত তরে, লোকোত্তর জ্ঞান।

দেশনায় তব হয়ে উদ্বুদ্ধ

জাতি-বিজাতি,

করে আগমন হেথা,

লভিতে পূত পদ ধূলি তব,

দিতে শান্তি, বিদগ্ধ অন্তরে

ক্ষণিকের তরে নশ্বর জীবনে।

উপেক্ষিয়া শীতাতপ, অঝোড়ে বরষা

করে আগমন, পূণ্যার্থী অগনন।

কে রাখে তার লিখা জোকা।

যায় চলে একদল

আসে পুনঃ কতদল

অবিরাম সারাটি বছর

গয়া ধামে যাত্রী যথা।

দিবসে নিশিতে যেথায়

শান্তির বাণী শোনাযায়,

বুদ্ধং স্মরনং গচ্ছামি,

ধম্মং সরনং গচ্ছামি,

সংঘং সরনং গচ্ছামি।

ধন্য তীর্থ রাজবন

ছায়া ঘেরা তপোবন।

হয়তো ইতিহাস ভুলে যাবে তোমায়

রবে যুগে যুগে তবস্মৃতি

নাহিক সংশয়।

ধন্য রাজা দেব শীষ,

রাজবন দাতা,

ধন্য মোরা পৌরজন

ধন্য রাঙ্গামাটি যত সাধু জন।

সাধু – সাধু – সাধু।

সার্থক জীবন

শ্রীমৎ ধর্ম্ম বোধি ভিক্ষু

রাজবন বিহার,

সুন্দর একটি নাম বনবিহার,

সেখানে নেই কোন অহংকার।

আছে শুধু শীল–সমাধি–প্রজ্ঞা সার,

দুর হয়ে যায় অবিদ্যা অন্ধকার।

বলা সহজ করা কঠিন,

অনেকে পাপে কাটায় দিন।

দুষ্কর্ম–দুঃশীল–চরিত্রহীন,

সে হয় পরাধীন।

ভাল–মন্দ না জানিয়া চলে যে জন,

মনে করিবে তাহার মত কেহ মূর্খ নন।

জীবন থাকিতে করে যে ধর্মাচরণ,

সার্থক হইবে তাঁর মানব জীবন।

নরকের বাস বড়ই ভয়ঙ্কর,

নিজেকে নিজেই উদ্ধার কর।

এমন সুযোগ পাবে না আর,

সময় থাকিতে ধরো পার।

পন্ডিত বলে মুর্খ ভাই,

নির্বাণ ছাড়া উপায় নাই।

যদি কেহ [দৈবাৎ] পাপ কর্ম করিয়া থাকে উহা যেন সে বারংবার না করে এবং উহাতে যেন তাহার রুচি না জন্মায়, (কারণ) পাপের সঞ্চয় দুঃখ জনক। **- ধম্মপদ**

যদি স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু বিপুল সুখের সম্ভাবনা দেখা যায় তবে ধীর ব্যক্তি বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সুখ (অবশ্যই) ত্যাগ করিবেন।

- ধম্মপদ।

বুদ্ধ বাবদা সঙ্গীত

অমর শান্তি চাক্‌মা

জয় জয় বুদ্ধ বাবদা

কোচ পানা সেয়ানি মিজেই

এজ্ঞ সংসারে বুদ্ধ নিজেনে

এক লগে বেগে মিজি থেই।।

এচ্যা জাদ বেজাদর নেই জগদাং

এগওরী গীত গেই এজ্ঞ গড়ি ফাং

এ্যাইল গাজে বাজে দোল পেগোগীদে

মিদে মিদের শুনি পেই।।

ছ রঙে রাঙেয়া দোল বাবদান

মিজি আগে যদনার আগপাদা সান

রাঙা রাঙা গোজেনর মেয়ে তুলে সদরব

তুম্বাজে মন ভরিনেই।।

প্রয়াত শ্রীমতি প্রণতি চাক্‌মার স্মরণে-

কালের প্রবাহে নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই জন্ম মৃত্যুর অধীন। এরই অমোঘ বিধানে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি বাবু সমর বিজয় চাকমার সহধর্মিনী শ্রীমতী প্রণতি চাকমা দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ৪/৭/৯৫ ইং তারিখে বেলা ১ ঘটিকার সময় নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর। তিনি রাজবনবিহার প্রাক্তন পরিচালনা কমিটির একজন সম্মানিত সদস্যা ছিলেন এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা ছিলেন। তিনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দেওয়ানের কন্যা এবং বর্তমান রাজমাতা ও রাজবনবিহার পরিচালনা কমিটির সভানেত্রী- রাজমাতা আরতি রায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

আমরা তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্বামী, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে তাঁহার পারলৌকিক জীবনের সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

- রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি।

প্রয়াত শ্রীমৎ কোন্ডন্য ভিক্ষুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বৌদ্ধ ধর্মে 'কার্যকরণ নীতি' অনুযায়ী উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কোন্ডন্য ভিক্ষু গত ৮ই অক্টোবর '৯৬ ইং রাত্রি ১১.০০ ঘটিকার সময় রাজবন বিহারে ৮০ বছর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি রাজবন বিহারে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) সকাশে উপসম্পদা গ্রহনের পর রাজবন বিহার ও বন্দুকভাঙ্গা মৌজার ভারবুয়া চাপ বন বিহারে ছয় বর্ষাবাস যাপন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাজবন বিহারের ভারবুয়াচাপ শাখা বন বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার গৃহীনাম ছিল হৃদয় রঞ্জন চাক্‌মা এবং তিনি লংগদু থানার তুলবান গ্রামের একজন ধর্মপ্রাণ উপাসক ছিলেন।

গত ১০ই অক্টোবর '৯৬ ইং বৃহস্পতিবার সকালে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি এবং ভারবুয়াচাপ বন বিহারের দায়ক–দায়িকাগণ প্রয়াত ভন্তের পারলৌকিক সদগতি কামনায় সংঘদান করেন এবং বেলা ১.০০ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপস্থিতিতে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় রাজবনের পশ্চিম প্রান্তে তাঁহার মরদেহ সৎকার করা হইয়াছে।

আমরা তাঁহার পারলৌকিক জীবনের সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

- রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি।